চিরহেমন্ত

বেঙ্গল টাইমস

১৬ জুন, ২০২৪

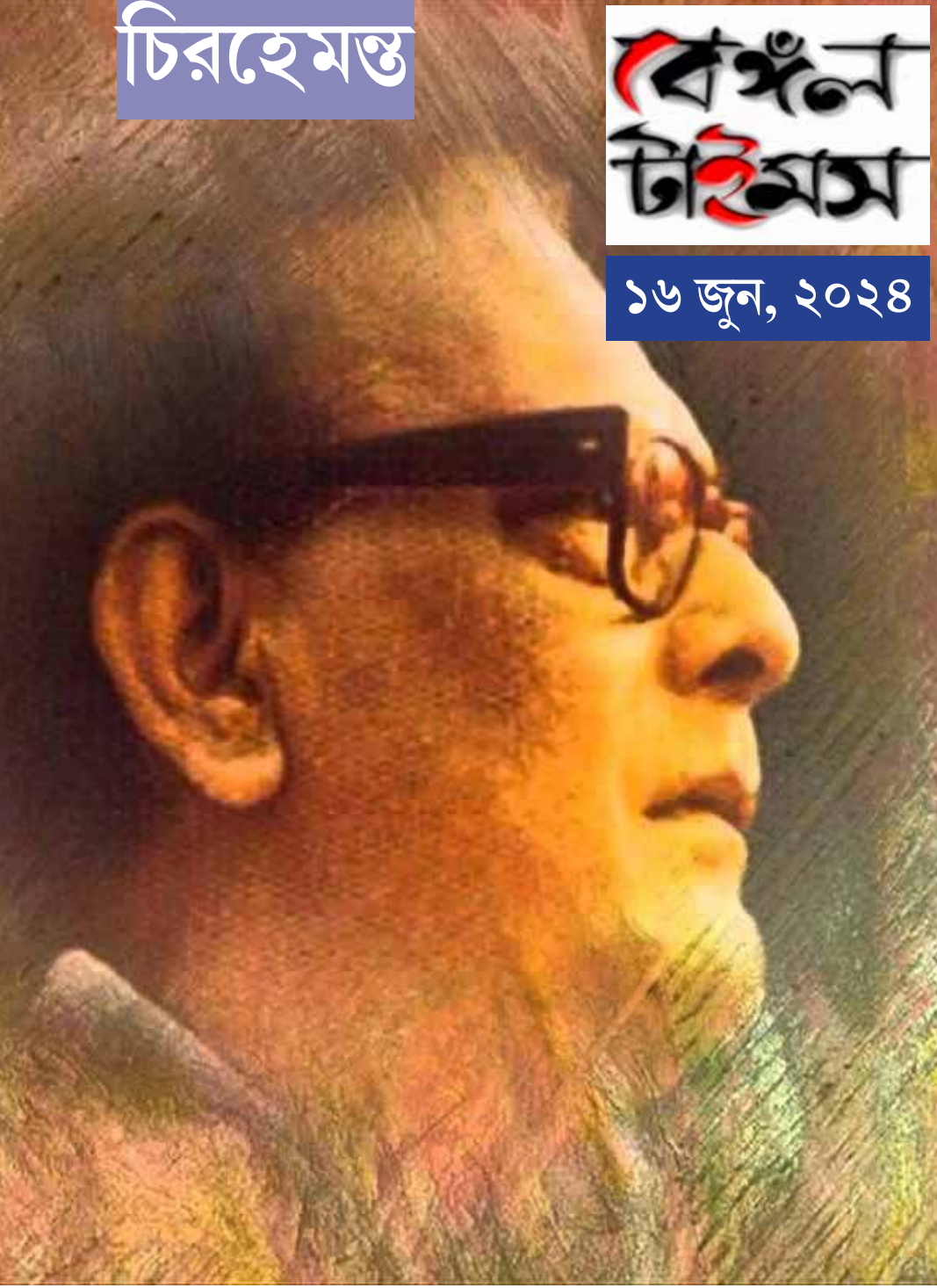

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

হেমন্ত স্মরণে

একদিকে প্রখর দাবদাহ। সূর্য যেন চোখ রাঙাচ্ছে। একটু বৃষ্টির অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে বাঙালি। অন্যদিকে, লোকসভা ভোটের রেশ যেন এখনও থেকে গেছে। সরকার গঠন হয়ে গেলেও নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন চলছে, তেমনই থেমে নেই নানা বিতর্ক। একদিকে টি২০ বিশ্বকাপ। অন্যদিকে শুরু হয়ে গেছে ইউরো কাপ। ঠিক এমনই আবহে এসে গেল আরও একটা ১৬ জুন। সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালির কাছে ১৬ জুন দিনটা একটু অন্যরকম। এই দিনটাকে তাঁরা চেনেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন হিসেবে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মানেই বাঙালির কাছে অন্য এক আবেগ। হাফহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতিতে মোড়া এক নিখাদ বাঙালিয়ানা। বাঙালি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এই মানুষটার গান শুনে আসছে। প্রেম, বিরহ, আনন্দ, বেদনা, প্রতিবাদ সব অনুভূতির সঙ্গেই মিশে আছে তাঁর গান। একই মানুষের ভেতর কত ভিন্ন সত্তার স্রোত। কখনও গায়ক, কখনও সুরকার। কখনও প্রযোজক, কখনও পরিচালক। একদিকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ, অন্যদিকে একের পর এক দুরন্ত গান তৈরি করে তুলে দিচ্ছেন অন্যদের কণ্ঠে।

চার বছর আগে পেরিয়ে গেছে তাঁর জন্ম শতবর্ষ। তখন ভয়াবহ করোনা আবহ। আমার রাজ্য, আমার দেশ, আমার পৃথিবী সবই যেন এক মৃত্যু উপত্যকা। টিভি চ্যানেল, কাগজ জুড়ে শুধুই যেন মৃত্যু মিছিল। অদ্ভুত এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। এমন আবহে কার জন্ম শতবর্ষ, কে আর মনে রাখে! ফলে, যে মানুষটা রাতের পর রাত জলসায় বাঙালির মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মানুষটার স্মরণে কোনও জলসা ছিল না।

থমকে থাকা সময়েই ঝড়ের কাছে তিনি নিজের ঠিকানা রেখে যান। পথ হারানোর জন্যই তিনি পথে নামেন। কী পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে গেয়েছিলেন, আমার গানের স্মরলিপি লেখা রবে। স্মরলিপির মানে সবাই বুঝুক বা না বুঝুক, মুখে মুখে ফেরা মানুষের গানে তিনি অমরত্ব পেয়েছেন।

১৬ মানে, সেই অমরত্বের উদযাপন। কিছু জানা, কিছু অজানা ঘটনার মেলবন্ধনে তাঁর জীবনের নানা দিককে একটু ছুয়ে দেখার চেষ্টা। পাশাপাশি যেহেতু, লোকসভা ভোটের সেই রেশ এখনও আছে, তাই তেমনই কিছু বিষয়ও উঠে এল।

বনস্পতির ছায়া দিলেন সারাজীবন

জীবনের অনেকটা সময়ই কেটেছে মুম্বইয়ে। অনেক দিন ধরেই শিল্পীদের সঙ্গে মিশছি। সেই হেমন্তবাবু-মান্নাবাবুদের সময় যেমন দেখেছি, তেমনি এখনকার শোনু নিগম, কুমার শানু, অলকা ইয়াগনিক, শ্রেয়া ঘোষালদেরও দেখছি। সবাই হেমন্তবাবুকে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সেটাও দেখেছি। প্রত্যেকেরই কিছু অভিনবত্ব আছে। কাউকে ছোট করার জন্য এই লেখা নয়। কিন্তু সবাইকে মনে রেখেও বলতে পারি, মানুষ হিসেবে হেমন্তবাবু সত্যিই এক বনস্পতি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ওই মাপের মানুষ আর দেখিনি। এই বনস্পতির ছায়াতেই আমাদের বেড়ে ওঠা।

মুম্বইয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন হেমন্তর সুরসঙ্গী হয়ে। কাছ থেকেই দেখেছেন কিংবদন্তি শিল্পীকে। কিছু স্মৃতি মেলে ধরলেন সুরকার অমিত দাশগুপ্ত।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছু বলতে গেলে রাতের পর রাত ফুরিয়ে যাবে। দীর্ঘ দিন এরকম এক বটবৃক্ষের ছায়ার তলায় কাটিয়েছি। অনেকটাই কাছ থেকে দেখা। কিছুটা তাঁর মুখ থেকে শোনা। আবার কিছুটা অন্যদের কাছ থেকে শোনা। তিনি গায়ক হিসেবে কেমন, সুরকার হিসেবে কেমন, এটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি মাত্রই সেটা জানেন। প্রত্যেকে নিজের মতো করে জানেন। শুধু বাঙালি কেন, ভারতের সঙ্গীতপ্রেমী মানুষমাত্রই জানেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে মানুষটার কয়েকটা দিক তুলে ধরতে চাই। নির্দিষ্টভাবে শুধু গান, সুর, ছবি নয়। সব মিলিয়ে মানুষটা কেমন, তার কিছু টুকরো টুকরো ছবি বরং তুলে ধরা যাক।

১) হেমন্তবাবুর গায়কি যেমন, সুর করার সময় সেই ধারাটাই বজায় রাখতেন। জোর করে নিজের কেরামতি দেখানোর চেষ্টাই করতেন না। তিনি বারবার বলতেন, উচ্চ মার্গের সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর নেই। কোনও ওস্তাদের কাছে তালিম নেননি। অন্যান্য গাইয়েরা যেমন তাল, রাগ নিয়ে আলোচনা করেন, হেমন্তবাবুকে তার ধারপাশ দিয়েও যেতে দেখিনি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়েও খুব একটা আলোচনা করতেন না। গানটা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি জানতেন, ফিল্মের একটা গান মানে আড়াই থেকে তিন মিনিটের ব্যাপার। তা যেমন মানুষের মনকে নাড়া দেয়। সেখানে নিজের গলার কাজ দেখানো বা পাণ্ডিত্য দেখানো উচিত নয়। এটা নিজের মুন্সিয়ানা দেখানোর জায়গা নয়। তাই মানুষের কাছে যেন গ্রহণযোগ্য হয়, বরাবর সেদিকেই নজর দিয়েছেন।

২) গান মানেই ধরে নেওয়া হয়, অন্তমিল থাকবে। কিন্তু হেমন্তবাবু এমন অনেক গানে সুর করেছেন, যার কোনও অন্তমিল নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চলে যেতে যেতে/দিন বলে যায়/ আঁধারের শেষে ভোর হবে/ হয়ত পাখি গানে গানে/ তবুও কেন মন উদাস হল।' কোথাও কোনও অন্তমিল খুঁজে পাচ্ছেন। এমনকী অন্তরা বা সঞ্চারিতেও কোনও অন্ত মিলের ব্যাপার নেই। আপনারা যখন শোনেন, তখন একবারও কি বেমানান মনে হয়! আর দশটা জনপ্রিয় গানের সঙ্গে কোথাও তফাত খুঁজে পান! এই হলেন হেমন্তবাবু। একটা গদ্যকেও অনায়াসে সুর দিতে পারেন। শ্রুতিমধুর করে তুলতে পারেন।

৩) হেমন্তবাবুর যে সমস্ত বিখ্যাত গান আমরা শুনেছি, তার প্রায় আশিভাগ গানের মুখরা তিনিই করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম একটা-দুটো লাইন ধরিয়ে দিতেন। তারপর গীতিকার লিখতেন। যেমন ধরা যাক, এই রাত তোমার আমার। উনি প্রথম লাইনটা বলে দিলেন। তারপর বাকিটা লেখা হল। এভাবেই জন্ম নিয়েছে একের পর এক বিখ্যাত গান। গীতিকাররা সেটা মেনেও নিতেন। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। যেমন সলিল চৌধুরি।

তিনি আবার নিজের কথা বদল করতেন না। এমনকী, দাঁড়ি, কমা বদল করলেও পছন্দ করতেন না।

৪) মুম্বইয়ের একটা মজার ঘটনা বলি। গল্পটা হেমন্তবাবুর কাছ থেকেই শোনা। বিআর চোপড়ার ছবি। সম্ভবত 'এক হি রাস্তা'। সুরকার হেমন্তবাবু। সবকটা গান তৈরি। সবাই খুশি। একটা গান নিয়ে আপত্তি জানালেন ডান্স ডিরেক্টর ঝান্ডে খাঁ। তাঁর দাবি, এই গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্য মানানসই হবে না। পরিচালক হেমন্তবাবুকে বললেন, এই গানটা বদলাতে হবে। কারণটাও বললেন। হেমন্তবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ঠিক আছে, দু তিন দিনের মধ্যেই বদলে দেব। তবে, আমারও একটা শর্ত আছে। আমিও শুটিং দেখব। যদি মনে হয়, গানের সঙ্গে নাচটা উপযুক্ত হচ্ছে না, তাহলে আবার শুট করতে হবে। বি আর চোপড়া পড়লেন মহা সমস্যায়। তিনি ঝান্ডে খাঁকে বললেন, খাঁ সাহেব, আপনি এই গানেই করতে পারেন তো করুন। নইলে আমি অন্য ডান্স ডিরেক্টর খুঁজে নেব। ঝান্ডে খাঁর বক্তব্য ছিল, উনি গানের লোক, উনি নাচের কী বোঝেন! হেমন্তবাবুর যুক্তি ছিল, উনি নাচের লোক হয়ে যদি গান বদল করতে বলতে পারেন, তাহলে আমি গানের লোক হয়ে নাচ বদল করতে বলতেই পারি।

৫) স্বর্ণযুগ থেকে এই সময়। অসংখ্য শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছি। প্রায় সবাইকেই বলতে শুনেছি, আমার যা প্রাপ্য ছিল, তা পাইনি। হেমন্তবাবু সেখানে ব্যতিক্রম। তিনি বারবার বলতেন, আমার যা প্রাপ্য, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। আমি কে? ভাল করে গান শিখিওনি। তারপরেও লোকে এতবছর ধরে আমার গান শুনছেন, এটাই বিরাট এক পাওনা। এর থেকে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!

৬) তাঁর গানের মতোই মানুষটাও ছিলেন একেবারে সোজাসাপটা। কোনও ভনিতা ছিল না। যেটা ভাল, সেটা প্রাণ খুলে প্রশংসা করতেন। যেটা ভাল লাগল না, সেটাও সামনেই বলতেন। সবথেকে বড় কথা, নিজের লিমিটেশন জানতেন। সেটা নিজের মুখে স্বীকার করতেও দ্বিধা করতেন না। আমার গানের ক্ষেত্রেও হয়েছে। হয়ত কোনও গান নিয়ে গেছি। উনি শুনে বলতেন, সুরটা খুবই ভাল হয়েছে। কিন্তু আমার গলায় এটা মানাবে না।

৭) কখনও কোনও শিল্পীর সমালোচনা করতে শুনিনি। প্রত্যেকের সম্পর্কেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। নতুনদের প্রশংসা করতেন দরাজ কণ্ঠে। এবং সেটা মেকি নয়। মন রাখার জন্যও নয়। মন থেকেই তিনি প্রশংসা করতেন। এমনকী কেউ প্ররোচিত করলেও কারও সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেন না। একবার সলিলদা হেমন্তবাবুর গাওয়া একটা গান (পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি) প্রতিজ্ঞা যেশু দাসকে দিয়ে গাওয়ালেন। ব্যাপারটা আমার ঠিক ভাল লাগেনি। তাঁকে গিয়ে বললাম, সলিলদা এটা ঠিক করলেন না। হেমন্তবাবু বিষয়টা জানতেন, কিন্তু কোনও রাগ বা অভিমান দেখালেন না। বললেন, ও হ্যাঁ, ওটা যেশু দাসকে দিয়ে গাইয়েছে। যদিও আমি শুনিনি। তবে যেশু দাস তো ভালই গায়। আশা করি, ভালই গেয়েছে। এই হলেন হেমন্ত মুখার্জি। আর কজন শিল্পী এটা খোলা মনে মেনে নিতে পারতেন, জানি না।

এইসব কালজয়ী গান আমার বাবা লিখেছেন!

পিয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্ত মুখার্জি মানে এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করা যায়। কিন্তু কাছে গেলেই কথা হারিয়ে যায়। এমন একজন মানুষের সামনে কী কথা বলব! তাই অনেকবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলেও সেভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার বা আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়নি।

তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমিও তাঁর বাড়িতে গেছি। এমনকী বম্বের বাড়িতেও গেছি। কিন্তু তারপরেও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়নি। প্রথমত, আমি তখন অনেকটাই ছোট। বড়দের কথার মাঝে ঢোকা ঠিক নয়, এটা জানতাম। তাঁর সঙ্গে আমার বাবা অর্থাৎ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হচ্ছে। মূলত গান নিয়ে, সিনেমা নিয়ে, এই জগতের মানুষদের নিয়ে। সেখানে আগ বাড়িয়ে আমার কিছু বলতে যাওয়াটা শোভনীয় হত না। তাছাড়া, তখন এসব তেমন বুঝতামও না। তাই বাবা কথা বলতেন হেমন্তবাবুর সঙ্গে। মা কথা বলতেন ওঁর স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আমি হয়ত রানুর সঙ্গে গল্প করছি। যেসব বিষয়ে আড্ডা হত, তখন সেসব কথার মানে বুঝতাম না। এখন নিজে সিনিয়র সিটিজেন হওয়ার পর কিছুটা বুঝতে পারি। আমার সঙ্গে হেমন্তবাবুর শেষ দেখা আমার বিয়ের সময়। উনি তখন খুবই অসুস্থ। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছিলেন। উপরে উঠতে পারেননি। নিচে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিলেন। ওই শরীর নিয়ে না এলেও পারতেন। কেউ রাগ করত না। তবু এসেছিলেন বাবার সঙ্গে তাঁর এত বছরের সম্পর্ককে মর্যাদা দিতে।

গান বাজনার ভেতরের কথা নিয়ে বাবাও বাড়িতে খুব একটা আলোচনা করতেন না। তাই বাবার কাছেও খুব বেশি গল্প শোনার

সুযোগ হয়নি। উনি হয়ত অন্যদের বলছেন বা ফোনে কাউকে কিছু বলছেন, সেখান থেকে কিছুটা শুনেছি। বাবার অন্যান্য বন্ধু ও পরিচিতদের কাছ থেকেও শুনেছি।

সেইসঙ্গে বাবার লেখা বই পড়েও কিছুটা জেনেছি। সবকিছু খুঁটিনাটি সাল-তারিখ

মনে নেই। আমার স্মৃতি-শক্তিও ভাল নয়। তাছাড়া, বাবার মতো আমি গুছিয়ে লিখতেও পারি না।

বাবার সঙ্গে হেমন্তবাবুর পরিচয় উনি গানের জগতে আসার অনেক আগে থেকেই। ভবানীপুরে ছিল বাবার দিদির বাড়ি। দুই ভাগ্নে। বড় ভাগ্নে সুশীল চক্রবর্তী বয়সে বাবার থেকে কিছুটা বড়ই ছিলেন। তিনি ছিলেন হেমন্তবাবুর বন্ধু। আরেকজন উত্তম কুমারের বন্ধু। দুজনেই ভবানীপুরের সেই বাড়িতে আসতেন। বাবাও যেতেন। তখন থেকেই বাবার সঙ্গে এঁদের পরিচয়। তখনও হে-মন্তবাবু বিখ্যাত হননি, উত্তম কুমার তখন পাড়ায় শখের যাত্রা করতেন, সিনেমা থেকে বহু যোজন দূরে। যেহেতু মামার বন্ধু, সেই সূত্রে উত্তম কুমার বাবাকে মামা বলেই ডাকতেন। বাবার সেই বড় ভাগ্নের বিয়েতে হেমন্তবাবু এসে গান গেয়েছিলেন। দরজার পাশে, এক কোনে বসে শুনেছিলেন উত্তম কুমার।

বাবারও তখন থেকেই একটু একটু গান লেখা শুরু। যতদূর শুনেছি, হেমন্তবাবু বাবার লেখা গান প্রথম করেন রামচন্দ্র পালের সুরে, প্রদীপ কুমারের লিপে। ছবির নাম অপবাদ। বাবা তখন থার্ড ইয়ারে পড়েন। তারপর হেমন্তবাবু বম্বেতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খুব নামডাক হয়। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতেন, বাবা দেখা করতে যেতেন। বাবার লেখা গান তখন অনেকেই গাইছেন, কিন্তু বারবার দেখা হলেও হেমন্তবাবুকে গান রেকর্ড করার কথা কিছুতেই বলতে পারছেন না। চেনা মানুষদের কাছে বরাবরই সঙ্কোচটা একটু বেশি হয়। অন্যদের কাছে যে আবদার করা যায়, চেনা মানুষদের কাছে সেই আবদার করা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একদিন এক ঘরোয়া আড্ডায় বাবা হেমন্তবাবুকে গান রেকর্ড করার প্রস্তাব দিলেন। উনি তখন বললেন, 'কই, তুমি তো আমাকে আগে কোনওদিন বলোনি। কোনও গান সঙ্গে এনেছো?' বাবা পকেট থেকে তিন চারটি গান বের করলেন। প্রথমেই পড়লেন, 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না/ ও বাতাস আঁখি মেলো না।' মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে হেমন্তবাবু বললেন, ব্যস ব্যস, আর শোনাতে হবে না। এখন আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। একটুও সময় নেই।'

এটা শোনার পর যে কোনও তরুণ গীতিকারের মন ভেঙে যেতে বাধ্য। গানটা নিশ্চয় পছন্দ হয়নি। পুরোটা শুনলেনও না! মাঝপথে থামিয়ে দিলেন! গানের প্রস্তাব না দিলেই বোধ হয় ভাল হত।

হেমন্তবাবু যাওয়ার আগে বলে গেলেন, আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার এই গানটা আর এর উল্টো পিঠে তোমার পছন্দের একটা গান লিখে বম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। আমি পরেরবার এসে রেকর্ড করব।

তখন বাবার তো বাকরুদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়া। কয়েক লাইন শুনেই একেবারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন! ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না— এটাই হেমন্তবাবুর কণ্ঠে রেকর্ড করা বাবার প্রথম আধুনিক গান। উল্টো পিঠে ছিল— কত রাগিনীর ভুল ভাঙাতে। দুটো গানই এতটা কালজয়ী, আজও শোনা যায়।

এভাবেই নতুন এক সম্পর্কের শুরু। সারাজীবন এই গানের সম্পর্ক দুজনেই ধরে রেখেছেন। বাবা বরাবরই বলতেন, 'আমার গানের দুই স্তম্ভ— একজন মান্না দে, আরেকজন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমি আজ যেটুকু স্বীকৃতি পেয়েছি, এই দুজনের জন্য।' এই দুজনের প্রতি বাবার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। এঁদের সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে বাবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিতেন।

একেকটা গানের পেছনে কত গল্প লুকিয়ে থাকে। সেইসব আড়ালের কথা আড়ালেই থেকে যায়। তার কতটুকুই বা আমরা জানি! বাবা কিছুটা লিখে গেছেন। তার অনেকগুন বেশি তাঁর মনেই থেকে গিয়েছিল। কারণ, বয়স হলে এমনিতেই স্মৃতি দুর্বল হয়ে আসে।

তাছাড়া, সব কথা প্রকাশ্যে আনতেও নেই। দু-একটা মজার কথা বলা যাক।

মণিহার ছবির গান তৈরির কাজ চলছে। গানের সিকোয়েন্স বোঝানো হচ্ছে। পরিচালক, প্রযোজক সবাই আছেন। হেমন্তবাবু সুর করে ফেলেছেন। গাইবেন লতা মঙ্গেশকার। বাবা দ্রুত লিখে ফেললেন কয়েকটা লাইন, 'নিঝুম সন্ধ্যায়/ পান্থ পাখিরা/বুঝি বা পথ ভুলে যায়।' সবার পছন্দ হয়েছে। এবার পরের লাইনগুলো লিখতে যাচ্ছেন। হেমন্তবাবু থামিয়ে দিলেন, এত সুন্দর গান। এখন তাড়াহুড়ো করে লিখতে হবে না। দুদিন সময় নাও। বাড়িতে বসে বাকিটা লিখবে। তিনদিন পর আবার সবার সামনে বাকিটা হবে।

সবাই উঠে চলে যাচ্ছেন। বাবাও উঠতে যাচ্ছেন। হেমন্তবাবু বললেন, পুলক একটু দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদের ওদিকেই যাব।

বাবা বসে পড়লেন। অমনি হেমন্তবাবু কাছে হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। বললেন, আজ তোমার মুড খুব ভাল আছে। আমারও ভাল মুড। বাকিটা এখনই তৈরি করে ফেলো। সেই সুরে বাবা

লিখে ফেললেন অন্তরা— 'দূর আকাশের উদাস মেঘের দেশে/ওই গোধূলির রঙিন সোহাগে মেশে।' পনেরো মিনিটের মধ্যেই গোটা গানটা তৈরি। দুজনেই দারুণ খুশি। এ যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাস। যাঁরা স্রষ্টা, শুধু তাঁরাই এই অনুভূতিটা বুঝতে পারেন।

বাবা গানটা হেমন্তবাবুকে দিতে গেলেন। উনি বললেন, এটা তোমার কাছেই রেখে দাও। তিনদিন পর সবার সামনে বের করবে। তুমি এখনই লিখে ফেললে, আর আমি এখনই সুর করে ফেললাম, এটা শুনলে ওরা ভাববে, আমরা দুজনেই ফাঁকি মেরেছি। ওরা গানের গুরুত্বই বুঝবে না। ভাববে, এ আর কী এমন কঠিন কাজ। তার থেকে ওরা বরং ভাবুক আমরা দুজনেই খুব গলদঘর্ম হয়ে দুদিন ধরে গানটা তৈরি করেছি।

তিনদিন পর যথারীতি বাবা সবার সামনে গানটা পকেট থেকে বের করলেন। হেমন্তবাবুর সুর তো তৈরিই ছিল। বাকিদের সামনে গেয়ে শোনালেন। অর্থাৎ, নিখুঁত চিত্রনাট্য মেনে দুজন অভিনয় করলেন। কেউ বুঝতেই পারল না গানটা তিনদিন আগেই তৈরি হয়ে গেছে।

একবার ডিসেম্বর নাগাদ হেমন্তবাবু পুজোর গান চেয়ে বসলেন। বাবা বললেন, পুজো তো অনেক দেরি। এখন থেকে গান চাইছেন! হেমন্তবাবু বললেন, জানুয়ারি থেকেই সবাই পিছনে পড়ে যাবে। সবাই চাইবে, তাদের লেখায়, সুরে আমাকে গান গাওয়াতে। কজনকে ফেরাব? আর আমি এত মিথ্যে বলতেও পারব না। তার থেকে তুমি বাপু আগেই তৈরি করে দাও। আমি যেন বলতে

পারি, আমার গান তৈরি হয়ে গেছে। এছাড়া বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।

আরেকবার বাবা অনেকদিন পর হেমন্তবাবুর বাড়ি গেছেন। হেমন্তবাবু বললেন, আরে পুলক, কতদিন পরে এলে বলো তো!

বাবা অমনি লিখে ফেললেন, 'কতদিন পরে এলে/একটু বোস/তোমায় অনেক কথা বলার ছিল/ যদি শোন।' এভাবেই তৈরি হয়ে গেল কালজয়ী একটা গান।

বাবার লেখা গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে রাগ-অনুরাগ। সঙ্গীত পরিচালক যথারীতি হেমন্তবাবু। ঠিক হল, ছটা গান গাইবেন হেমন্তবাবু, একটা গান লতা মঙ্গেশকার। মহিলা কণ্ঠের গানটা তৈরি হচ্ছে। বাবা একটা গানের মুখরা লিখেছেন। অন্তরাটা লিখছেন। হঠাৎ হেমন্তবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন, এটা হচ্ছে না। অন্য সুর করছি। তুমি অন্য গান লেখো।

বাবা ভাবলেন, ছবির গান মুলতুবি। এখন বোধ হয় আধুনিক গান লিখতে বলছেন। হেমন্তবাবু বললেন, না না, তোমার ছবির সিকোয়েন্স ভেবেই বলছি। এই কথাগুলো ঠিক মানান সই হচ্ছে না। বাবা তো অবাক। তিনি নিজে কাহিনী লিখেছেন। হেমন্তবাবু চিত্রনাট্যও পুরোটা শোনেননি। শুধু গল্পের সারসংক্ষেপ শুনেছেন। সেখানে হেমন্তবাবু কিনা সিকোয়েন্স নিয়ে ভাবছেন! হেমন্তবাবুই শুরুটা বলে দিলেন। লেখা হয়ে গেল, 'ওই গাছের পাতায়/ রোদের ঝিকিমিকি/আমায় চমকে দাও।' এভাবেই হেমন্তবাবু কত গান ধরিয়ে দিয়েছেন। কত গান শুরু করে দিয়েছেন। শুনেছি, হেমন্তবাবু 'গাছের পাতায়' গানের শুরুটা বলার পরই বাবা দ্রুত গানটা লিখেই তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম ছুঁড়ে ফেলে হেমন্তবাবুকে প্রণাম করেছিলেন। তখন এই ছিল সুরকার-গীতিকারের শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক। এখন এগুলো রূপকথা মনে হবে।

এভাবেই কত কালজয়ী গান তৈরি হয়েছে। কত ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেইসব গানের পেছনে! এত বছর পরেও পুজো প্যান্ডেল থেকে বিয়েবাড়ি, রিয়েলিটি শো থেকে সিরিয়াল, মাঝে মাঝেই বেজে ওঠে সেইসব গান। ভাবতে গর্ব হয়, এইসব কালজয়ী গান আমার বাবা লিখেছেন!

উত্তমের ‘নেপথ্যকণ্ঠে’ নেই হেমন্ত, তবু একসঙ্গে

উত্তম আর হেমন্ত যেন এক যুগলবন্দি। কিন্তু এমন অনেক গান আছে, যে ছবিতে উত্তম আছেন, কিন্তু হেমন্তর গান অন্য কারও লিপে। কোথাও উত্তম শ্রোতা। আবার কোথাও গান বাজছে নেপথ্যে। এমনই এক অন্যরকম যুগলবন্দির কাহিনি তুলে ধরলেন পৃথা কুণ্ডু।

পূর্বস্মৃতি হারানো স্বামীর বাড়িতে এসেছেন এক নারী। নিজের মর্যাদা, অবস্থান, অহং বিসর্জন দিয়ে গভর্নেসের কাজ নিয়েছেন – স্বামীর কাছাকাছি থাকবেন বলে। অথচ স্বামী তাঁকে চিনতে পারেন না, তাঁর নিরুচ্চার ভালবাসায় ভরা উদ্বেগকে দূরে ঠেলে দেন – ‘কৌতূহল থাকা ভাল, কিন্তু কৌতূহলের একটা সীমারেখা থাকা দরকার।’ ভদ্রলোক অবশ্য বোঝেন, চাকরি করতে আসা এই মহিলা বিবাহিতা। তাই পরে যখন তিনি জানতে চান ভদ্রমহিলার স্বামীর কথা, উত্তর আসে, ‘আমার স্বামী আমাকে ভুলে গেছেন!’ এ উত্তর যেন একটু ভাবিয়ে তোলে ভদ্রলোককে। একলা ঘরে তাঁর ভাবনার সঙ্গী হয় রেডিও থেকে ভেসে আসা একটি গান – ‘আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে।’

সাদাকালো পর্দার মায়ায় আর সেই মায়াবী কণ্ঠের আবেশে একসময় মজেছিল

আম-বাঙালি, আজও সে আবেশ একেবারে হারিয়ে যায়নি। কিন্তু 'হারানো সুর' ছবির এই গানটির জনপ্রিয়তার আবেগে কেবল না ভেসে আমরা কি ভেবেছি, কতটা ব্যতিক্রমী ছিল এই গানের প্রয়োগ? গানটি পুরুষকণ্ঠে। ঘরের মধ্যে বসে শুনছেন আর এক পুরুষ, যাঁর ঠোঁটে এর আগে ওই কণ্ঠেরই গান প্রভূত সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু এখানে গানটি তাঁর নয় – 'এই শপথের মালা খুলে/ আমারে গেছ যে ভুলে/তোমারেই শুধু দেখি বারে বারে আজ শুধু দূরে থেকে।' আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের কথা তো তাঁদেরই মানায়, সব জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করেও যাঁদের কল্যাণী মূর্তিতে আড়ালে থাকতে হয় 'নিজেরে লুকায়ে রেখে'। অন্যভাবে বলতে গেলে –গানটি যেন উত্তমের উদ্দেশে হেমন্ত গাইছেন সুচিত্রার হয়ে! শোনা যায়, ছবিতে এই গানটি রাখার জন্য গায়ক-সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হয়েছিল পরিচালক এবং নায়ক-প্রযোজকের যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও। আমরা সবাই জানি – কতখানি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এই গানটি ছবির সাফল্যের ক্ষেত্রে।

এ এক ভিন্নধারার 'যুগলবন্দি'র আখ্যান – উত্তমের সাথেই আছেন হেমন্ত, কিন্তু তাঁর ঠোঁটে গান গাইছেন না। এমন উদাহরণ কিন্তু কম নয় এই জুটির সহাবস্থানের ইতিহাসে। 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৯৫৩) ছবিতে দেখা যায়, বন্দি রাজপুত্রের চরিত্রে উত্তম ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে হেমন্তর গান শুনে কাঁদছেন। এটি তাঁর প্রথম দিককার ছবি। খেয়াল করলে বোঝা যাবে, অন্যান্য দৃশ্যের তুলনায় এই চোখের জল ফেলার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অনেক পরিণত – সে কৃতিত্বের ভাগীদার কি

গায়কও নন? আবার নৌকায় বসে বৈরাগীর মুখে 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' শুনে তিনি বোনকে বলছেন – 'ডাকতে হয় না রে, দরকার হলে উনি নিজেই আসেন'। এ ছবিতেও উত্তমের সাথেই আছেন হেমন্ত, কিন্তু তাঁর মুখের গানে নন – বরং জড়িয়ে আছেন, ছড়িয়ে আছেন ছবি জুড়ে। 'সূর্যতোরণ' ছবিতে 'ওরা তোদের গায়ে মারবে লাথি' যেন নায়কের প্রতিবাদী সত্তার সমর্থনেই কথা বলছে, কিন্তু গানটি গাইছে এক পথ-অভিনেতা। আবার উত্তম যখন সুচিত্রার গাড়ি চালাচ্ছেন, তাঁর অব্যক্ত প্রেমকে ভাষা দিচ্ছে গাড়ির মিউজিক সিস্টেম থেকে ভেসে আসা হেমন্তর গান – 'তুমি তো জানো না।' এ ছবিতে অন্য একটি গান অবশ্য উত্তমের মুখেই, 'হোক না আকাশ মেঘলা'। 'দুই ভাই' ছবিতে উত্তমের লিপে দুটি গান গেয়েছেন হেমন্ত, বাকিগুলি বিশ্বজিতের লিপে, উত্তম শ্রোতা। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ গানগুলো গাইছেন 'ছড়িদার' অনিল চট্টোপাধ্যায়। পাগলের ভূমিকায় উত্তম কুমারের মনের গ্লানি কিন্তু অনেকটা প্রকাশ পায় অনিলের গানে গানে।

'সূর্যতপা' ছবিতে জহর রায়ের লিপে 'কে যাবে কে যাবে' গানটি হেমন্ত গাইছেন একান্তই 'খোকাবাবু'র জন্য, তবে 'সব কিছু বোঝান কি যায়' গানটির শ্রোতা উত্তম, সঙ্গে সন্ধ্যা

রায়। ‘ধন্যি মেয়ে’র গান দুটির ক্ষেত্রেও উত্তম সরাসরি শ্রোতার ভূমিকায় নেই।

‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ছবিতেও প্রথম গানটি বাউলের কণ্ঠে – ‘তার অন্ত নাই গো’। রাইচরণরূপী উত্তমের মুখে তাঁর কোন গান নেই। কিন্তু উত্তমের অভিনয়ের সঙ্গতে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটিতে অসাধারণ আবহ রচনা করেছেন হেমন্ত। খোকাবাবুকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে রাইচরণ। ছবিতে এই দৃশ্যটি প্রায় ছ মিনিটের – দু-তিনবার ‘খোকাবাবু’ বলে ডাকা ছাড়া আর কোন সংলাপ নেই। আবহে সঙ্গীত পরিচালক ক্রমাগত বাজাচ্ছেন তারসপ্তকে বাঁধা বেহালা, বেদনার অভিব্যক্তির সঙ্গে ‘কি হয় কি হয়’ ভাব ফুটছে তাতে। এমনই অমোঘ সেই স্বরপ্রয়োগ – যে এতক্ষণ ধরে শুনতে একটুও একঘেয়ে লাগে না। তারপর যখন পাড় ভাঙছে উত্তাল নদীর ঢেউ, রাইচরণ বুঝতে পারছে যে খোকা তলিয়ে গেছে, তখন ওই আবহের সুরটিকেই নিজের গলায় তুলে আনেন হেমন্ত – সব হারিয়েও কেবল সুরসম্বল এক হাহাকারের মত শোনায় তাঁর কণ্ঠে চড়া পর্দায় ‘ম - গ ম গ র স’ হয়ে মধ্য সপ্তকে ‘ণ ধ প গ ম গ’···সেই সঙ্গে রাইচরণের মুখে রিক্ততার অভিব্যক্তি মিলে যায় মর্মস্পর্শী দৃশ্যায়নে।

‘কমললতা’ ছবিতে শ্রীকান্তের (উত্তম কুমার) মুখে হেমন্তর গান নেই, এমনকি আর এক প্রধান চরিত্র গহর মিয়াঁর (নির্মল কুমার) মুখেও গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। হেমন্তের গানগুলি রাখা হয়েছে এক ‘খ্যাপা গোঁসাই’-এর মুখে। আপনভোলা মানুষ, তাঁকে দেখা যায় খুব কম; অথচ তাঁর গাওয়া কীর্তনের সুর সর্বত্র ভেসে বেড়ায়। বৈষ্ণব আখড়ার আপন-করা, প্রেমমাখা পরিবেশ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর গানে গানে। ‘ভজহুঁ রে মন’, ‘বনসন আওত নন্দ দুলাল’, ‘নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ’, ‘এই না মাধবীতলে’ – গানগুলো ছাড়া কমললতার আখড়া ভাবা যায়? নেপথ্যে ‘দেখ সখি সাজিল নন্দকুমার’ গানটির অনুষঙ্গে শ্রীকান্ত আর কমললতা রাধাকৃষ্ণের জন্য মালা গেঁথে পরস্পরের দিকে তাকায় – তৈরি হয় এক মরমিয়া দৃশ্য পট। আবহে সেই এক ও অদ্বিতীয় হেমন্ত।

‘স্ত্রী’ ছবিতে উত্তমের লিপে গাইলেন মান্না দে, আর সৌমিত্রের লিপে হেমন্ত। ততদিনে নানা কারণে ঘটে গেছে উত্তম-হেমন্তর মধুর সম্পর্কে কিছু অনভিপ্রেত কালিমাপাত। কেন জানি না এক আশ্চর্য সমাপতনের মতই মনে হয় এ ছবিতে হেমন্তর গাওয়া গানগুলির অন্তর্নিহিত বক্তব্য - বিশেষ করে জবাবি গানদুটি যেন উত্তমের অভিনীত চরিত্রটির উদ্দেশেই

গাওয়া – ‘কালো আমার ভাল লাগে না’, আর ‘রাজা, যে টাকাটা মারছ ছুঁড়ে’। অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি বললে উত্তমের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু উত্তম যখন ভোলা ময়রার চরিত্রে, অ্যাণ্টনির ভূমিকায় তখন বিশ্বজিৎ, আর তাঁর গলায় গেয়েছেন হেমন্ত। ছবির নাম ‘ভোলা ময়রা’। ‘ধনরাজ তামাং’ ছবিতে আবার পাই অন্য ধরনের যুগলবন্দি - হেমন্তকণ্ঠে ‘ধনরাজ তামাং একটি শুধু নাম’ গানটিও নামভূমিকায় থাকা মানুষটিকে পাহাড়ি উপকথার সঙ্গে একাকার করে দেয় নেপথ্যের সুরবিস্তারে। এর পাশাপাশি মনে পড়বে ‘অগ্নীশ্বর’ ছবিতে ‘পুরানো সেই দিনের কথা’। গানটি যখন পর্দায় এল, বয়স্ক নায়ককে দেখতে আসা পুরনো বন্ধুদের মত দর্শকও নতুন করে ভাবতে বসল – বাইরে থেকে কড়া মেজাজি, বেপরোয়া, বিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ডাক্তারবাবুর মধ্যে অসহায় বিপত্নীকের প্রাণ এমন করে লুকিয়ে ছিল! পর্দায় গানটি গাইছেন অসীম-কুমার। অথচ এ গানের অভি-ব্যক্তির পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে উত্তম-অভিনীত চরিত্র-টির এক গোপন গভীর দিক। এ ছবিতে আর একটি গানের প্রয়োগও অভিনব। ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ দেশাত্মবোধক দ্বিজেন্দ্রগীতি হিসেবেই প্রচ-লিত। কিন্তু এখানে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের দেশভ্রমণ আর নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সূত্রে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ হয়ে ওঠা – এক খাঁটি, উন্নত চরিত্রের দেশপ্রেমিক, সেবাব্রতীর চোখ দিয়ে দেশকে দেখার অনুভূতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই গানের অবিস্মরণীয় গায়নে। শেষ দৃশ্যে ডাক্তারের হাত কেঁপে ফুলগুলো পড়ে যাওয়া, উঠোনে লোকের ভিড়, তারপর পর্দা জুড়ে চিতা জ্বলে ওঠা – সবকিছুর সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে যায় গানটির শেষ স্তবক – ‘ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি / আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি’। সৌজন্যে সেই অনুপম কণ্ঠ – যার আবেদনে মৃত্যু হয়ে ওঠে অমৃত। উত্তমের অনবদ্য অভিনয় যদি এই অন্তিমদৃশ্যটির শরীর, তবে হেমন্তর গান তার আত্মা। প্রায় একই কথা বলা যায় ‘কাল তুমি আলেয়া’ ছবির ‘যাই চলে যাই’ প্রসঙ্গে। এ ছবির নায়ক তথা সুরকার ছিলেন উত্তম কুমার। ভাঙা সম্পর্ক ততদিনে আবার জোড়া লেগেছে কিছুটা – ‘ছোট ভাই’-এর সুরে গান গাইতে সানন্দেই রাজি হয়ে-ছিলেন হেমন্ত। উত্তমের মুখে নয়, কিন্তু একটি মৃত্যুদৃশ্যের আবহ হিসেবে তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে এক অবিস্ম-রণীয় যুগলবন্দি রচনা করেছে এই গান। এবং, ‘হারানো সুর’-এর মতো এই গানটিও এক প্রয়াতা নারীর (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) বিদায়বাণী। উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর একটি অনবদ্য স্মৃতিচারণা–সহ গানের ডালি সাজিয়ে দিয়েছিলেন হেমন্ত – সেটি এইচএমভি-র রেকর্ডে, ক্যাসেটে অনেক উত্তম-হেমন্ত অনুরাগীই সংগ্রহে রেখে দিয়েছেন। তার শেষ গান ছিল ‘চৌরঙ্গী’ ছবির ‘কাছে রবে, কাছে রবে’ – খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে এই লেখার উপসংহারে এসে। পর্দায় গানটি গেয়েছেন বিশ্বজিৎ – কিন্তু এ গান যেন উত্তমের উদ্দেশেই গাইছেন হেমন্ত। দুই মহাব্যক্তিত্বের শেষ হয়েও শেষ-না-হওয়া সম্পর্কের চিরায়ত অভিজ্ঞান আর কী-ই বা হতে পারে!

কৃতজ্ঞতা : অধ্যাপক প্রদোষ ভট্টাচার্য

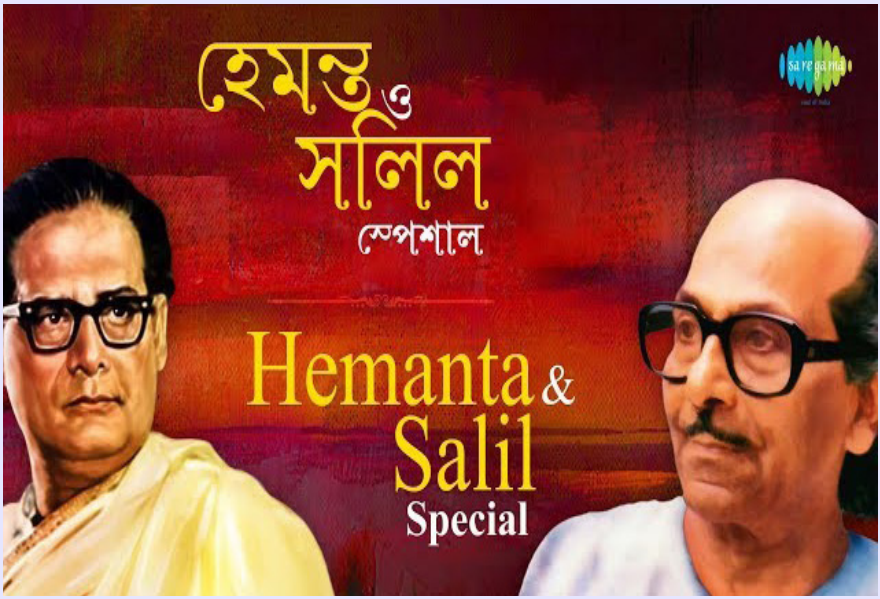

‘রসুন’ সংস্কৃতির আসল জন্মদাতা কিন্তু হেমন্তই

ময়ূখ নস্কর

আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ছিল ক্যাসেটের জমানা। তখন প্রায় প্রতিটি বাঙালি বাড়িতে ‘লিজেন্ডস অফ গ্লোরি’ নামে একটি ক্যাসেট থাকত। সম্ভবত বাংলা গানের ইতিহাসে এটিই জনপ্রিয়তম ক্যাসেট। সলিল চৌধুরির সুরে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দশটি গানের সংকলন। এই ক্যাসেটটি বাঙালির জীবনে ‘রসুন’ সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল।

‘রসুন’ মানে পেঁয়াজ-রসুন নয়। এই শব্দটির সৃষ্টিকর্তা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। তথাগতবাবু ব্যঙ্গ করে বলতেন, বাঙালিকে রসুন সংস্কৃতি ছাড়তে হবে। অর্থাৎ বাঙালি রবীন্দ্র, সুকান্ত-নজরুলে আচ্ছন্ন। সিপিএম নাকি জোর করে বাঙালিকে ‘রসুন’ খাওয়াতে চাইছে। রসুন-এর প্রতি তথাগতবাবু বা বিজেপির রাগ থাকা স্বাভাবিক। কারণ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে তাঁদের স্বদেশচিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তা খাপ খায় না। নজরুল মুসলমান। আর সুকান্ত বামপন্থী। কিন্তু তথাগত-বাবুর মন্তব্য থেকে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলা কবিতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হলেন এই তিনজন। যাঁরা তাঁদের পছন্দ করেন না, তাঁরাও এই তিনজনের নাম এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের পাশে সুকান্ত স্থান পেলেন কীভাবে? এই স্থান তো মাইকেল বা জীবনানন্দও পেতে পারতেন। একুশ বছরের সাহিত্য জীবনে সুকান্ত যত প্রতিভারই পরিচয় রাখুন, রবীন্দ্র-নজরুলের পাশে বসার মতো সৃষ্টিসম্ভার তাঁর ছিল না। বাংলার বাম শাসকরা জোর করে সুকান্তকে প্রথম সারিতে বসিয়ে দিয়েছেন, একথা বলা যাবে না। কারণ, বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বামপন্থী। এবং তাঁরা কবি হিসেবে সুকান্তর থেকে কম তো নন, বরং বেশি। তাহলে সুকান্ত প্রথম তিনজনের মধ্যে স্থান পেলেন কীভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই লেখার শুরুতে যে ক্যাসেটটির কথা বলেছি, তাতে আছে সুকান্তর লেখা তিনটি গান। অবশ্য সুকান্ত গান লিখতে জানতেন না। এই কবিতাগুলি গান হবে, এই ভেবে লেখেনওনি। নিছক কবিতা হিসেবেই লিখেছিলেন। তাঁর কবিতায় সুর দিয়ে গানে পরিণত করেছিলেন সলিল চৌধুরি। আর সেই গানে প্রাণ দিয়েছিল হেমন্তর কণ্ঠ। অবাক পৃথিবী, বিদ্রোহ, রানার, ঠিকানা এই গানগুলি না থাকলে বাঙালি হয়ত এতদিনে সুকান্তকেও ভুলে যেত। যেভাবে ভুলে গেছে দীনেশ দাসের মতো একদা সাড়া জাগানো 'কাস্তে' কবিকে। দীনেশ দাস বা বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন, সেগুলি বাঙালি আর পড়ে না। কিন্তু সুকান্তর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' বাঙালি আজও মনে রেখেছে। কারণ, বিষ্ণু দে বা দীনেশ দাশের কোনও রচনায় হেমন্ত কণ্ঠ দেননি। তাই তাঁদের রচনা সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় পৌঁছয়নি। তাই তাঁরা রবীন্দ্র-নজরুলের পাশে স্থানও পাননি।

হেমন্ত আর সুকান্তের সেতুবন্ধন একদিকে যেমন সলিল চৌধুরি, অন্যদিকে অবশ্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই পদাতিক কবির অত্যন্ত প্রিয়। হেমন্তর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, দুজনের আলাপও ছিল। আবার সুকান্ত সমগ্র থেকে জানা যায়, প্রথম জীবনে হেমন্তর কণ্ঠ খুব একটা

ভাল লাগত না সুকান্তর। তাঁর বৌদি সরযূ দেবী লিখছেন—

'সুকান্ত সে সময় রেডিওর যে কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীকে মোটেই পছন্দ করতো না তিনি হলেন হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়। একথা শুনলে আজকের দিনে নিশ্চয়ই সকলে খুব অবাক হবেন। কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা নয়।

হেমন্তকুমার তখন নতুন শিল্পী। সবে রেডিওতে গাইছেন। তাঁর নরম নিচু কণ্ঠস্বর মোটেই পছন্দ হত না সুকান্তর। হেমন্তর প্রোগ্রামের আগেই সে বলতো, বৌদি, এবার একজন ভদ্রমহিলা গান গাইবেন। শুনবে তো এসো।

আজ হেমন্তকুমার একথা শুনলে নিজেও নিশ্চয়ই হাসবেন। সে সময় সুকান্ত তাঁকে পছন্দ না করলেও পরবর্তীকালে তিনিই সুকান্তর গান গেয়ে তাকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেকখানি জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন। যা সুকান্ত দেখে যেতে পারেনি।'

সেই সুকান্তর লেখাই সলিল চৌধুরির সুর বেয়ে পৌঁছে গেল হেমন্তর কাছে। আর হেমন্তকেও বিভিন্ন ফাংশানে, অনুষ্ঠানে এই গান গাইতেই হত। রবীন্দ্রনাথের গানকে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর কবল থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে (এমনকী পুজো প্যান্ডেলে) পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই হেমন্তই অকাল মৃত সুকান্তকে মৃত্যুঞ্জয়ী সুকান্ত-তে পরিণত করেছেন। বাঙালির 'রসুন' সংস্কৃতির অন্যতম স্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই রসুন-এর স্বাদ-গন্ধ থেকে বাঙালির মুক্তি নেই।

সিনেমায় কিশোরকে দিয়ে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েছিলেন হেমন্তই

কুণাল দাশগুপ্ত

এমনকী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে ঠোঁট মেলাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি কিশোরকুমার। এ বড় অবাক করা ঘটনা। ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পায় বাংলা ছবি 'দুষ্টু প্রজাপতি।' ছবিতে কিশোর কুমারের একাধিক গান থাকলেও 'সুখ নামে শুক পাখীটি' গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই। দুই বর্মণে সমৃদ্ধ হলেও কিশোর কণ্ঠে হেমন্তের গান খেলা করেছে দীর্ঘ সময় ধরে।

বাংলা ছবিতে হেমন্ত–কিশোর যুগলবন্দীর শুরু ১৯৫৮ সালে। 'লুকোচুরি' দিয়ে। বাংলায় কিশোর কুমারের ছবি বললেই কোন ছবিটা সবার আগে ভেসে ওঠে! এই লুকোচুরি। ছবিতে নায়ক কিশোর কুমার। পরিচালক কিশোর কুমার। প্রযোজকও কিশোর কুমার। অর্থাৎ টাকাও তিনিই ঢেলেছিলেন। সেই ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন হেমন্তকেই। অর্থাৎ, সেই ছবিতে গাওয়া কিশোরের সব গানই হেমন্তর সুরে। বাঙালির একটা সচেতন স্নায়ু যতদিন টিকে থাকবে, প্রাণবন্ত থাকবে, 'এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়।' কী আশ্চর্য! একটা দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ মনে করেছে, এটি রবি ঠাকুরের সৃষ্টি। অনেকেই এই ভ্রান্তির শিকার। এমনকী এটা নিয়ে রীতিমতো তর্কও হয়েছে। এ কেমন সম্মোহন মনোবিজ্ঞান যেখানে থমকে যায়। এ কেমনই বা মায়াজাল যেখানে কল্পিত ম্যান্ড্রেক সামান্য শিক্ষানবীশ হয়ে যায়। একই ছবিতে 'এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়', সেই ছবিতেই 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ'। সুরের বৈচিত্র্য বোঝাতে এর থেকে ভাল উদাহরণ আর কী হতে পারে!

আরও একটা কারণে মাইলস্টোন হয়ে থাকতে পারে এই ছবিটি। বাংলা ছবিতে কিশোরকুমারকে প্রথম-বার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেখা যায় ওই 'লুকোচুরি' ছবিতেই। 'মায়াবন বিহারীণি হরিণী'। রুমাদেবীর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে। সত্যজিৎ রায় সম্ভবত উৎসাহিত হয়েছিলেন লুকোচুরির থেকেই। বাংলা ছবিতে কিশোরের রবীন্দ্র সঙ্গীত বললেই অনেকে চারুলতার 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' ভেবে বসেন। ঘটনা হল, সত্যজিৎ রায়ের অনেক আগেই এই কাণ্ডটি করে দেখিয়েছিলেন হেমন্ত মুখার্জি। 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' ছবিতেও শীর্ষ সঙ্গীতটি করেন কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। 'মধ্যরাতের তারা' তে অতিথি শিল্পী কিশোরকুমারের গাওয়া মজাদার গান 'জন জন জন জন জন্মদিন' -এর সুর দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ই। সাতের দশকের গোড়ার দিকে নিজের ছবি 'অনিন্দিতা'তে কিশোর কুমারের গাওয়া 'ওগো নিরুপমা' সিনেমা হল থেকে সটান বাঙালির বৈঠকখানায় চলে এল। কমেডি গান করিয়ে ছিলেন 'প্রক্সি' ছবিতেও। 'কী করে বোঝাই তোদের।' সে গান এখনও সজীব।

মুখোপাধ্যায় ঝেড়ে ফেলে হেমন্ত যখন কুমার হলেন তখন, 'কুমার হোল স্কোয়ার' হিন্দি গানে রঙ ঢেলেছেন। 'গার্লফ্রেন্ড'-এর 'আজ রোনা পড়া' বা 'কস্তিকা খামোশ' শুধু নয়, 'খামোশি' ছবিতে 'ও সাম কুছ অজীব থী' বহু মানুষের বহু যন্ত্রণাভরা সন্ধের সঙ্গী হয়ে এসেছে। একই ছবিতে হেমন্ত গেয়েছেন অসাধারণ একটি গান, 'তুম পুকারলো'। চাইলে এই

গানটাও (ও সাম কুছ আজীব থী) গাইতেই পারতেন। কিন্তু সেরা গানটা তুলে রেখেছিলেন কিশোরের জন্য। এখানেই সুরকারের সংযম। সেরা গানটা নিজে না গেয়ে অন্যকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য বড় মাপের কলিজা লাগে।

বড় মধুর সম্পর্ক ছিল দুই কুমারের মধ্যে। কিশোর-কুমার অভিনিত 'দো দুনি চার' ছবির 'হাওয়াওপে লিখদো'র হামিং শুনলে বোঝা যায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কতটা প্রভাবিত করছিলেন কিশোর কুমারকে। হিন্দিতে কিশোরের লিপে হেমন্তর গান? তাও আছে। কিশোর পরিচালিত দূর গগন কি ছাও মে। সেখানে হেমন্ত গাইছেন, 'রাহি তু রুখ মত যা না।'

শোনা যায়, কিশোর কুমারকে কলকাতায় প্রথমবার মঞ্চে আনার নেপথ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বড় অবদান ছিল। কিশোর এত এত দর্শকের সামনে গান গাইতে রাজি হচ্ছিলেন না। হেমন্তই তাঁকে ভরসা দেন, 'তুমি চলো। কোনও চিন্তা নেই। আমি তোমার পেছনেই থাকব। কোথাও কোনও সমস্যা হলে আমি সামলে দেব।' সামলাতে অবশ্য হয়নি। রবীন্দ্র সরোবরে টানা দেড় ঘণ্টা মাতিয়ে রেখেছিলেন কিশোর কুমার। মঞ্চে গাওয়ার এমন এক আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেলেন, যা দিয়ে মঞ্চ মাতিয়ে গেছেন সারা জীবন।

আরও একটি বাংলা অ্যালবামের কথা না বললেই নয়। কিশোর কুমারের ইচ্ছে হয়েছে, দীর্ঘদিন পর তিনি পুজোর গান গাইবেন। এবং হেমন্তর সুরেই গাইবেন। ক্যাসেট কোম্পানির কর্তারা চাইলেন, হালকা সুরের কোনও গান। হেমন্ত রাজি হলেন না। বললেন, 'এটা নন ফিল্মি গান। গানের মধ্যেই ছবিটা দেখাতে হবে। এখানে হালকা গান চলবে না। তাছাড়া, সিরিয়াস গান কিশোর দারুণ গায়। আমি বানালে সিরিয়াস গানই বানাব।' তাই হল, তিনটে সিরিয়াস গান, একটা একটু হালকা স্বাদের। গানগুলো হল আমার পূজার ফুল, চোখের জলের হয় না কোনও রঙ, সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে, কেন রে তুই চড়লি ওরে। পরে মেগাফোন কোম্পানির কর্তা এসে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কেন রে তুই চড়লি ওরে'টা একটু দলছুট হয়ে গেল। হেমন্ত বলেছিলেন, আমি তো ওটা রাখতে চাইনি। তোমরাই তো জোরাজুরি করলে।

'আমার পূজার ফুল' এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এখনও পুজো প্যান্ডেলে ওই গানটা বাজে। কিশোরের নিজেরও খুব প্রিয় ছিল এই গানটা। আশি সালের পর থেকে প্রায় সব অনুষ্ঠানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় 'হেমন্তদা'র সুরারোপিত 'আমার পূজার ফুল' দিয়ে শুরু করতেন।

মুম্বাই-এর 'গৌরীকুঞ্জ'-এ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর একদিন বর্ষামঙ্গল হয়ে ঝড়ে পড়েছিল, কূল ছাপানো সুরনদী আজও স্নিগ্ধ করে সুর পিয়াসী অসংখ্য মানুষকে। কিশোরের বসন্ত জুড়ে ছিলেন হেমন্ত।

অহঙ্কারের যোগ্য জবাব দিয়েছে অযোধ্যা

প্রশান্ত বসু

এবারের লোকসভায় কোন কেন্দ্রের ফল সবথেকে বেশি আনন্দ দিয়েছে? চাইলে আমাদের রাজ্যের ৪২টা কেন্দ্রের কথা ভাবা যেত। কিন্তু পরে মনে হল, না, নিজের রাজ্য নয়। এর উত্তর ভিন রাজ্যেই লুকিয়ে আছে। উত্তর হল, অযোধ্যা। আরও ভালভাবে বললে, ফৈজাবাদ। এখানে যে বিজেপি হারতে পারে, সত্যিই ভাবিনি। বলা যায়, কল্পনারও অতীত ছিল। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই ধাক্কাটা সত্যিই খুব জরুরি ছিল।

রামকে যেভাবে রাজনীতির আঙিনায় এনে ফেলা হয়েছে, তা কখনই মন থেকে মেনে নিতে পারতাম না। আমি কোনও রামায়ন বিশারদ নই। রামায়ন জ্ঞান বলতে ছোটবেলায় প্রতি রবিবার সকালে

রামানন্দ সাগরের সেই সিরিয়াল। আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কিছু লেখা। আর লোকমুখে কিছু গল্প শোনা। অন্যদের গল্পে কিছুটা কান পাতা।

আমার ধারণা, বিজেপির যাঁরা রাম রাম করে চিৎকার করেন, তাঁদের জ্ঞানও ওই টুকুই। বা হয়তো আরও কম। অন্তত টিভির আলোচনা শুনে মনে হয়, আমি তবু ছোটবেলায় রামায়নটুকু দেখেছি। এই আহাম্মকরা সেটাও দেখেননি। বা দেখলেও বেমালুম ভুলে গেছেন। কিছুই আত্মস্থ করতে পারেননি। বাল্মীকি বলুন, তুলসীদাস বলুন, কৃত্তিবাস বলুন, কোনও রামায়নই এঁরা পড়েননি।

এবার যেভাবে রাম মন্দির উদ্বোধন হল, তাতে রামকে নেহাতই গৌণ চরিত্র মনে হয়েছে। এ যেন একজনকে প্রতিষ্ঠা করার মহামঞ্চ। নিজেকে জাহির করা কোন নির্লজ্জ স্তরে পৌঁছোতে পারে এবং মূলস্রোত মিডিয়া কতটা নির্লজ্জ স্তাবকতা করতে পারে, তা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। আগেরবার একটা পুলওয়ামা ছিল। এবার যদি তেমন মোক্ষম কোনও ইস্যু না পাওয়া যায়। অতএব, রামের নামেই ভোট বৈতরনী পেরোতে হবে। একটা দল দশ বছর সরকার চালিয়েছে। তারপরেও তাদের এমন ইস্যু খুঁজতে হয়! দশ বছরের সাফল্যকে ছাপিয়ে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রচার করতে হয়!

এঁরা কি সত্যিই রামের অনুরাগী? রামের জীবন দর্শনের সঙ্গে এঁদের জীবন দর্শনের কোনও মিল আছে? রাম বাবার সামান্য একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে রাজত্ব ছেড়ে জঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আর এঁরা ক্ষমতায় আসার জন্য সব করতে পারেন। যত দূর নীচে নামার, নামতে পারেন। রাম ধর্মের নামে বিভেদ বা বিভাজন চাননি। কিন্তু বিভাজন আর ঘৃণাই এঁদের মূলমন্ত্র। যদি ক্ষমতায় থাকার জন্য রামমন্দির গুঁড়িয়ে দিতে হয়, এঁরা সেটা করতেও কসুর করবেন না। এত অনাচার কি সত্যিই রামের সহ্য হয়!

জানি না, সত্যিই রাম বলে কেউ আছেন কিনা। যদি থেকে থাকেন, তাহলে তিনি উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

চন্দ্রবাবুরা খামোকা বিরোধী হতে যাবেন কোন দুঃখে!

রক্তিম মিত্র

কেন্দ্রে তাহলে কারা সরকার গড়ছে? আচ্ছা, নীতীশ কুমার কি ইন্ডিয়া শিবিরে চলে যাবেন? চন্দ্রবাবু নাইডু নিশ্চয় বিজেপিকে লেজে খেলাবেন! তিনি অন্যদিকে চলে যাবেন না তো! কদিন ধরেই এরকম জল্পনা চলছে। কিছু মিডিয়া, কিছু পোর্টালে চলছে। আর সেগুলির লিঙ্কই কপি পেস্ট হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে হোয়াটস্অ্যাপে।

কেন এমন অবান্তর প্রশ্ন ওঠে, মাথায় ঢোকে না। বিজেপি সংখ্যা গরিষ্ঠতার কাছাকাছি। এনডিএ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাপিয়ে অনেকটাই বেশি। তারপরেও এই সংশয়ের কী মানে! গত কয়েকবছরে আমরা কোন ছবিটা দেখেছি? বিজেপি ম্যাজিক ফিগারের থেকে অনেক পিছিয়ে, সেই অবস্থায় অন্য দল ভাঙিয়ে তারা সরকার তৈরি করেছে। অথবা, অন্য দলের সরকার চলছে। সেখান থেকে মাঝপথে কিছু বিধায়ককে কেনাবেচা করে নিজেদের সরকার তৈরি করেছে। সেই দল গরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেও সরকার গড়তে

পারবে না? এই যাঁদের রাজনীতি বোধ, তাঁরাও কিনা ‘রাজনৈতিক বিশ্লেষক’ হয়ে যাচ্ছেন!

বিজেপি যদি দুশোর নীচেও নেমে যেত, তাহলেও সরকার গড়তে কোনও সমস্যা হত না। কারণ, বিরোধী শিবিরে তাদের অনেক গোপন বন্ধু আছে। একবার ভ্রু পল্লবে ডাক দিলেই তারা চন্দনের বনে ঠিক হাজির হয়ে যাবে। আর চন্দ্রবাবু নাইডু খামোখা অন্য শিবিরে কেন যেতে যাবেন? তিনি বরাবর বিরোধী থেকে শাসকের দিকে গেছেন। খামোখা শাসক থেকে বিরোধীদের দিকে যেতে যাবেন কেন? তিনি এত বছর বাদে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। তিনি ভাল করেই জানেন, কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে গেলে তাঁর সরকার যে কোনওদিন পড়ে যেতে পারে। তারপরেও তিনি খামোখা কেন্দ্রকে নিজের শত্রু বানাতে যাবেন কোন দুঃখে!

হ্যাঁ, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিজেপির আগের সেই দাপট হয়তো কিছুটা কমবে। মোদি যেভাবে কথায় কথায় আমিত্বের ফোয়ারা ছোটাতেন, আপাতত কিছুদিন তা কমবে। কিন্তু আমিত্ব যাঁর রক্তে এভাবে মিশে আছে, তিনি বাকি পাঁচ বছর ‘আমরা’র জয়ধ্বনি দেবেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কদিন গেলেই আবার সেই স্বমহিমায় ফিরবেন। তিনিও ভাল করেই জানেন, চন্দ্রবাবু নাইডু বা নীতীশ কুমারেরও যাওয়ার বিশেষ জায়গা নেই। তাঁদেরও ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, এই শিবিরেই থাকতে হবে। যদি চলেও যান, কিচ্ছু যায় আসে না। অন্য শিবির থেকে অনেক বন্ধু হাজির হয়ে যাবে। বাম সরকারে কি সিপিএমের কর্তৃত্ব ছিল না? ইউপিএ সরকারে কি কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ছিল না? তেমনই এই সরকারে বিজেপির কর্তৃত্বও থাকবে। আর বিজেপির কর্তৃত্ব থাকলে মোদির কর্তৃত্বও থাকবে। বড়জোর, কৌশলগত কারণে সুর কিছুটা নরম হবে।

এমন ‘সাহসী’ প্রধানমন্ত্রী আছেন বলেই কীর্তিমানরা ৭ লাখে জেতেন

রক্তিম মিত্র

তখনও ভাল করে গণনা শুরুও হয়নি। তখনও কোনও কেন্দ্রের ফলাফলই সামনে আসেনি। হঠাৎ দেখা গেল, ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী চিৎকার করছেন। হলটা কী? জানা গেল, কাউন্টিং সেন্টারে তাঁর এজেন্টদের নাকি হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে। অত্যাচার এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তাঁরা গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে চলে এলেন। প্রার্থীও চলে এলেন। এজেন্টরাও চলে এলেন। নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে ধর্নায় বসে গেলেন। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই বাম এজেন্টরাও বেরিয়ে এলেন। অভিযোগ সেই একই। গণনা কেন্দ্রে চলছে তুমুল সন্ত্রাস। কেন্দ্রীয় বাহিনী নীরব দর্শক।

না, এতে খুব একটা অবাক হওয়ার মতো উপাদান নেই। একের পর এক ঘটনাক্রমের দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিশেষ একজনের বিরুদ্ধে তদন্তের সময় সিবিআই-ইডি কেন ঘুমিয়ে থাকে, তা তো দিনের আলোর

মতোই পরিষ্কার। এবার ভোটের কার্যক্রমে আসা যাক। বিজেপি একের পর এক কেন্দ্রে প্রার্থী দিলেও একটি কেন্দ্রে ঝুলিয়ে রাখা হল। সেখানে নাকি বিরাট চমক অপেক্ষা করছে। শেষমেশ এমন একজনকে দাঁড় করানো হল, পর্বতের মুষিক প্রসব বললেও কম বলা হয়। বিজেপি কর্মীদের মধ্যেই সমীক্ষা করুন। অন্তত আশি শতাংশ সমর্থক তাঁর নামটাও কখনও শোনেননি। যা হওয়ার, তাই হল। বিজেপি যে এই আসনটা যুবরাজকে ওয়াকওভার দিতে চাইছে, সেটা বুঝতে কারও বাকি থাকল না। প্রচারেও সেই একপেশে ছবিটা বেরিয়ে এল। অধিকাংশ

বিধানসভায় বিজেপির প্রচারের কোনও অস্তিত্বই রইল না।

ভোটের দিন কী হয়েছে, তার কতটুকুই বা মিডিয়ায় এসেছে। শুধু এটুকু দেখা গেল, যেখানেই বিজেপি প্রার্থী যাচ্ছেন, তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী নীরব দর্শক। কারণ, যাঁরা বিজেপি প্রার্থীকে হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ইনি আসলে কেউ নন। ইনি আসলে ডামি ক্যান্ডিডেট। কেন্দ্রীয় বাহিনী কিছুই করবে না। কারণ, তাঁদের কিছু করতে বারণ করা আছে।

এবার গণনা। ফলতা বা সাতগাছিয়ার প্রত্যন্ত বুথে কী হয়েছে, ফলাফলে বোঝা যাবে। কিন্তু গণনা কেন্দ্রে তো ন্যূনতম নিরাপত্তা থাকবে। সেখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কার্যত পাত্তাই দিল না শাসকদল। বুঝিয়ে দেওয়া হল, তোমাদের মুরোদ জানা আছে। বাহিনীর কর্তারাও জানেন, খোদ প্রধানমন্ত্রী এখানে ললিপপ প্রার্থী দিয়েছেন, খোদ প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সব কেন্দ্রে প্রচারে গেলেও এই কেন্দ্রে আসেননি। খোদ প্রধানমন্ত্রী এই কীর্তিমানের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হতে দেন না। সিবিআই ইডি কে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। অতএব বাহিনীর জওয়ানদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায় কী?

হ্যাঁ, এই কীর্তিমান সাত লাখ ভোটে জিতবেন না তো কে জিতবেন? এরপরেও এই প্রধানমন্ত্রীকে সাহসী প্রধানমন্ত্রী বলবেন? যাঁরা মোদি মোদি জয়ধ্বনি দেন, যাঁরা এই বাজারেও বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, বুকে হাত রেখে বলুন তো, এমন 'সাহসী' প্রধানমন্ত্রী আপনি আপনার জীবনে দেখেছেন?

ছবি বানানোর চেষ্টা কেন যে করতে গেলেন!

প্রসূন মিত্র

গায়ক হেমন্তকে সবাই চেনেন। সুরকার হেমন্তও বাঙালির কাছে অচেনা নন। কিন্তু এই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আরও কয়েকটা সত্তা ছিল। একেবারে প্রথম জীবনে তিনি হতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক। বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্প দেশ পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত গানের কথা সেভাবে ভাবেননি। তাঁর গায়ক হয়ে ওঠা মূলত কবি-বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। তিনিই জোর করে আকাশবাণীতে নিয়ে গিয়ে অডিশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বলা যায়, হেমন্তর সাহিত্য জগতের সেখানেই ইতি।

কিন্তু এর বাইরেও আরও দুটো সত্তা আছে। তিনি হিন্দি ও বাংলা ছবির প্রযোজক ও পরিচালক। এই ভূমিকায় তিনি যে খুব সফল হয়েছিলেন, এমন নয়। বরং বেশ ব্যর্থই বলা যায়। বুঝলেন, এটা তাঁর কাজ নয়। আবার ফিরে গেলেন গানের দুনিয়ায়।

হেমন্ত তখন বম্বেতে হেমন্ত কুমার হয়ে গেছেন। বেশ বিখ্যাত। আর্থিকভাবেও বেশ সাচ্ছন্দ্য। একদিন বম্বেতে হেমন্তর বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন ভূপেন হাজারিকা। নানা গল্পের মাঝে ভূপেন হাজারিকা টেনে আনলেন হিন্দি লেখিকা মহাদেবী বর্মার একটি গল্পের কথা। গল্পটির নাম চিনা ফেরিওয়ালা। হেমন্ত তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, এই গল্পটি নিয়ে বাংলায় সিনেমা বানাবেন।

কিন্তু পরিচালনা কে করবেন? কোনও একজন এক তরুণ পরিচালকের কথা বললেন। তাঁর নাম মৃণাল সেন। তখনও মৃণাল সেনকে সেভাবে কেউ চিনতেন না। তাঁকে ডেকে পাঠানো হল বম্বেতে। তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হল পরিচালনার দায়িত্ব। শোনা যায়, নায়ক হিসেবে প্রথমে ভেবেছিলেন উত্তম কুমারকে। উত্তম কুমার নাকি প্রাথমিকভাবে রাজিও ছিলেন। কিন্তু চিনা ফেরিওয়ালার মেক আপ নিতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা লেগে যাবে। শুধু মেক আপের জন্য এতখানি সময় দিতে উত্তম রাজি হলেন না। তখন ডাক পড়ল কালী ব্যানার্জির। ছবিতে হেমন্তর দুটি অসাধারণ গান ছিল— ১) ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। ২) নীল আকাশের নীচে ওই পৃথিবী। দুটি গানই সুপারহিট। ছবিটাও বেশ সাড়াজাগানো। দিল্লিতে একটি বিশেষ শো করা হয়েছিল। দেখতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তাঁরাও উচ্ছ্বসিত এমন একটি ছবি দেখে। জন্ম হল নতুন এক পরিচালকের— মৃণাল সেন।

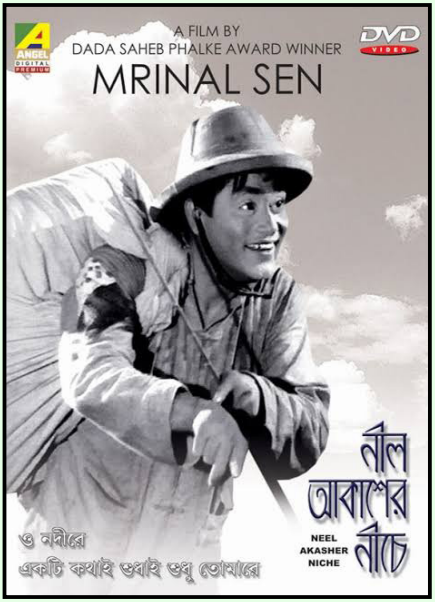

প্রযোজক হিসেবে সাড়াজাগানো প্রথম ছবির পর এবার চাইলেন বম্বেতেও ছবি পরিচালনা করতে। বেছে নিলেন বিশ সাল বাদ। নায়ক বিশ্বজিৎ, নায়িকা ওয়াহিদা রহমান। সেই ছবিটাও দারুণ হিট। হেমন্তর কণ্ঠে ছিল, বেকারার করকে হামে ইউ না যাইয়ে, লতার কণ্ঠে কঁহি দীপ জ্বলে, কঁহি দিল।

এরপর উত্তম কুমারকে নায়ক করে হিন্দি ছবির পরিকল্পনা। ছবির নাম শর্মিলি। থাকবেন উত্তম আর ওয়াহিদা রহমান। উত্তম কুমার রাজি ছিলেন। সর্বভারতীয় পত্রিকায় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল। ঠিক হল, আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে প্রথম শুটিং হবে। কিন্তু এই ছবি থেকেও উত্তম সরে দাঁড়ালেন। এই সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, সেই সময় উত্তমের হাতে বারোখানা বাংলা ছবি ছিল। সেগুলো অসমাপ্ত রেখে বম্বে ছবি করায় সায় ছিল না। আবার কোনও কোনও সূত্র থেকে উল্টো কথাও শোনা যায়। মহানায়ককে কেউ কেউ বুঝিয়েছিলেন, এটা

নায়িকা প্রধান ছবি। এখানে ওয়াহিদা রহমানই আসল। উত্তমের বিশেষ কিছু করার নেই। বাংলার মহানায়ক এমন গুরুত্বহীন ভূমিকায় কাজ করবেন! এই কারণেই নাকি উত্তম যেতে রাজি হননি।

কারণ যাই হোক, এবার উত্তম সরে আসায় হেমন্ত দুঃখই পেয়েছিলেন। অনেক ব্যবসায়িক ক্ষতিও হয়েছিল। বাধ্য হয়ে সেই ছবির ভাবনা বাতিল করে বিশ্বজিৎ,ওয়াহিদাকে নিয়ে করলেন কোহরা। ছবিটি সেভাবে চলল না। অনেক ক্ষতির মুখে পড়লেন। কিন্তু তারপরেও এর ওর কাছ থেকে টাকা ধার করে করলেন মজলি দিদি, বিবি আউর মকান। দুটো ছবিও ব্যর্থ। এরপর রাজেশ খান্নাকে নিয়ে খামোশি। সেটা কিছুটা সফল। হেমন্ত প্রযোজিত শেষ ছবি 'বিশ সাল প্যাহলে'। এবার নায়ক তাঁর পুত্র জয়ন্ত। এই ছবিটাও একেবারেই চলল না। এদিকে, বাজারে তখন প্রচুর দেনা।

তখনকার মতো বম্বের পাট চুকিয়ে হাত দিলেন বাংলা ছবিতে। এবার প্রযোজকের পাশাপাশি তিনিই পরিচালক। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী (অনন্যা) নিয়ে তৈরি হল অনিন্দিতা। নায়ক শুভেন্দু, নায়িকা পুত্রবধূ মৌসুমি। এই ছবিটাও খুব একটা চলল না। তবে গানগুলো বেশ হিট। কিশোরকে দিয়ে গাইয়েছিলেন ওগো নিরুপমা, নিজে গাইলেন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে', লতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন, 'ওরে মন পাখি।'

এখানেও মোহভঙ্গ। বুঝলেন, প্রযোজনা বা পরিচালনা তাঁর কাজ নয়। গান গাওয়া, সুর দেওয়াতেই আরও বেশি করে মন দিলেন। প্রযোজনা বা পরিচালনা করতে গিয়ে কার্যত দেনার দায়ে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা। রাত জেগে, একের পর এক জলসায় গান গেয়ে টাকা তোলার মরিয়া চেষ্টা। সেই দেনা শোধ করতেই লেগে গেল বেশ কয়েক বছর।

তাঁর ঘনিষ্ঠদের অনেকেই মনে করেন, প্রযোজনা বা পরিচালনার দিকে পা না বাড়ালে আরও অনেক কালজয়ী গান উপহার দিতে পারতেন। রাতের পর রাত এভাবে জলসা করে বেড়াতে হত না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, অন্য শাখায় নিজেকে মেলে ধরতে গিয়ে গায়ক হেমন্তর প্রতি বোধ হয় কিছুটা অবিচারই করেছেন।

বৃদ্ধা এসে তুলে দিলেন নারকেল নাড়ুর ঠোঙা

রজত সেনগুপ্ত

দক্ষিণ কলকাতার একটি জলসার কথা। লোকের মুখে শোনা। পরে কোনও একটি পত্রিকাতেও বিষয়টি পড়েছিলাম।

একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন হেমন্ত মুখার্জি। করতালির ঝড় উঠছে দর্শকাসন থেকে। অনেকগুলি গান গাওয়ার পর মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। এবার পরবর্তী শিল্পীর ডাক পড়েছে।

মঞ্চ থেকে অনেক-টাই চলে এসেছেন। এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। কিছু বলতে চান। হেমন্তবাবু এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা একটি ঠোঙা হাতে ধরিয়ে দিলেন। দেখা গেল, তাতে আছে নারকেল নাড়ু।

বৃদ্ধা বললেন, অনেক দূর থেকে তোমার গান শুনতে এসেছি বাবা। আমি নিজের হাতে তোমার জন্য এই নাড়ু বানিয়ে এনেছি। তুমি গান শুনিয়ে আমার মন ভরিয়ে দিলে। কিন্তু তুমি তো আমার সবথেকে প্রিয় গানটাই গাইলে না।

হেমন্ত জানতে চাইলেন, কোন গানটা?

বৃদ্ধা বললেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই।

হেমন্ত সেই বৃদ্ধাকে বললেন, আপনি একটু বসুন। বলেই আবার ফিরে গেলেন মঞ্চে। ততক্ষণে নতুন শিল্পী গাওয়ার জন্য প্রস্তুত। যন্ত্রশিল্পীরাও বাজানোর জন্য তৈরি। হেমন্ত কানে কানে গিয়ে সেই উদীয়মান শিল্পীকে কিছু একটা বললেন। সেই উদীয়মান শিল্পী সসম্মানে মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হেমন্ত বললেন, আমি আর একটি গান গাইব। তারপরই পরের শিল্পী আপনাদের গান শোনাবেন।

গান শুরুর আগে বললেন, আজ আমার এক মা এই জলসায় এসেছেন আমার গান শুনতে। তিনি একটি গান শুনতে চেয়েছেন। সেই গানটি গেয়েই আমি নেমে যাব।'

তারপরই তুলে ধরলেন নারকেল নাড়ুর সেই ঠোঙা। বললেন, আমার সেই মা এগুলো এনেছেন। আমি কি এতখানি ভালবাসার যোগ্য! বলেই গাইতে শুরু করলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই।

তারপর সেই বৃদ্ধার সঙ্গে হেমন্তর আবার দেখা হয়েছিল কিনা জানি না। এরকম ঘটনা হয়ত আরও অনেক আছে। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনাটি বুঝিয়ে দেয়, শ্রোতাদের তিনি কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। সেইসঙ্গে বোঝা যায়, তিনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

জীবনের চরম একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন

সৈকত মিত্র

ছোট থেকেই গানের পরিমণ্ডলে মানুষ। বাড়িতে আসতেন দিকপাল শিল্পীরা। তৈরি হত কত কালজয়ী গান। আমি তখন নিতান্তই ছোট। সব কথার মানেও বুঝতাম না। একটু একটু করে সুরগুলো ভাল লাগতে শুরু করল। বাড়িতে যে গানটা তৈরি হচ্ছে, বাবা যেটা রিহার্সাল দিচ্ছেন, সেটাই কদিন পর সিনেমায় দেখছি, রেডিওতে শুনছি। এ এক অন্য অনুভূতি। সেই মুগ্ধতাকেই বয়ে বেড়ালাম বাকি জীবনেও। তাই অন্য কোনও পেশার কথা না ভেবে আমিও গানকেই আঁকড়ে ধরলাম।

আমি পরম সৌভাগ্যবান। হেমন্তজেঠুর সুরে আমার গান গাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেটা ১৯৮৯। তাঁর সুরে গেয়েছিলাম ‘ঘর ছেড়ে চলে যেও/ঘর ভেঙ যেও না।’ হেমন্তবাবুর তখন শরীর ভাল নয়। উনি তখন বাইরে অনুষ্ঠান করা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাইরেও খুব একটা বেরোচ্ছেন না। ফলে, কাছে বসে গান তুলিয়ে দিতে পারতেন না। এমনকী রেকর্ডিংয়ের সময়েও থাকতে পারতেন না। উনি ক্যাসেট করে পাঠিয়ে দিতেন। সেই ক্যাসেট শুনেই শিল্পীরা গান তুলে নিতেন। আমিও সেভাবেই গানটি তুলেছিলাম।

উনি বলেছিলেন, রেকর্ড করা হয়ে গেলে ক্যাসেটটি যেন ফেরত দিয়ে আসি। আমিও কথা দিয়েছিলাম, ফেরত দিয়ে আসব।

এর মধ্যে আমার গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে। অনেকেই প্রশংসা করছেন। কিন্তু হেমন্ত জেঠুর ক্যাসেটটা এর ফেরত দেওয়া হয়নি। ভেবেছিলাম, লোকের হাতে পাঠাব না। একদিন তাঁকে প্রণাম করে আমার রেকর্ড-টি তাঁকে দিয়ে আসব। সেইদিনই ক্যাসেটটি ফেরত দেব।

কাল নয়, পরশু— এই গড়িমসিতে আর যাওয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে রবীন্দ্র সদনে একটা অনুষ্ঠান ছিল। আমি গ্রিনরুম থেকে বেরোচ্ছি। হঠাৎ দেখি, হেমন্ত জেঠু ঢুকছেন। আমি প্রণাম করলাম। উনি কাঁধে হাত রেখে বললেন, কথা দিয়ে কথা রাখো না। এটা তো ভাল নয়।

আমি তো প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

উনিই বুঝিয়ে দিলেন, তোমার না ক্যাসেটটা দিয়ে আসার কথা ছিল।

আমার তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা। সত্যিই খুব লজ্জায় পড়ে গেলাম। কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, জেঠু, কাল অবশ্যই দিয়ে আসব।

পরেরদিন ওই ক্যাসেট দিতে তাঁর বাড়ি গেলাম। উনি বললেন, কাল আমার কথায় কিছু মনে করোনি তো! আমি তো তোমার পিতৃতুল্য। এটুকু তো বকতেই পারি।

তার কয়েকদিন পরেই উনি মারা গেলেন। আমাদের মাথার ওপর থেকে যেন একটা আকাশ সরে গেল। পরের বছর, নেতাজি ইনডোরে তাঁর স্মরণে বিশাল অনুষ্ঠান হল। আমি গেয়েছিলাম পাল্কির গান। কোরাসে গলা মিলিয়েছিলেন সলিল জেঠু, শিবাজিদা, কল্যাণদা। তিরিশ বছর পেরিয়ে গেল। এখনও বারবার মনে পড়ে সেই দিনটা। বারবার মনে পড়ে সেই কিংবদন্তি মানুষটার কথা। চেষ্টা করি, কথা দিয়ে কথা রাখতে। শুধু গান নয়, আমাকে জীবনের চরম একটা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু সুরের জন্যই অমরত্ব পেতে পারতেন

অমিত ভট্টাচার্য

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নামটা শুনলেই কানে বাজে এক জলদগম্ভীর কণ্ঠ। সিংহভাগ মানুষের কাছে যাঁর পরিচয় একজন বাণিজ্যিক ছবির গায়ক এবং প্রথিতযশা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর ওই কণ্ঠই বোধ হয় তাঁর সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছে। অন্তত সুরকার হেমন্ত গায়ক হেমন্তকে দোষারোপ করতেই পারেন। কারণ, গায়ক হেমন্তর কাছে অনেকটাই চাপা পড়ে গেছেন সুরকার হেমন্ত। অথচ, শুধু সুরের জন্যই তিনি অমরত্ব পেতে পারতেন।

১৯৪৭ সালের বাংলা ছবি ‘অভিযাত্রী’ তে সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। আনন্দমঠ (১৯৫২) তাঁর সুরকার প্রথম হিন্দি ছবি। ১৯৫৪ সালের ছবি ‘নাগিন’ এ সুর করে জীবনের একমাত্র ‘ফিল্মফেয়ার বেস্ট মিউজিক ডিরেক্টর (১৯৫৫)’ এর পুরস্কার পেয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকর এর কণ্ঠে ঐ ছবির ‘মন ডোলে মেরা মন ডোলে’ আজও সঙ্গীতপ্রেমী ভারতবাসীর মনকে দোলা দেয়।

হেমন্ত নিজেই জানিয়েছিলেন,

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। অথচ তাঁর সুর শুনে কখনও তেমন মনে হয়নি। তাঁর থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অনেক বেশি পন্ডিত মানুষ এই দেশে ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু হেমন্তের সুর শুনে মনে হয় পান্ডিত্যের থেকে মেধার প্রয়োগ করাটাই অনেক বেশি আন্তরিক। যে কোনও বিষয়কে মাথায় রাখার থেকেও হৃদয়ে স্থান দেওয়া বেশি জরুরি। তাঁর সুর ছিল তাঁর গানের মতোই সোজাসাপ্টা। পাণ্ডিত্য জাহির করার কোনও চেষ্টা নেই। একেবারে সহজিয়া সুর। যা কানের ভেতর দিয়ে মরমে ঠিক পৌঁছে যায়। তার চেয়েও বড় কথা, যার জন্য সুর করা, তাঁর উপযোগী করে গানটা তৈরি করা। কোনটা লতা পারেন, কোনটায় কিশোর বেমানান, কোনটা কার লিপে যাবে, সেই অনুযায়ী গায়ক বা গায়িকাকে বেছে নেওয়া। একটা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে যা সম্ভব নয়।

বাংলায় সুরের হাতেখড়ি অভিযাত্রীতে হলেও প্রথম বড় মাপের সাফল্য এল শাপমোচন ছবিতে (১৯৫৫)। তখন তিনি মুম্বইয়েই (তখন বম্বে) বেশি থাকতেন। সেখানে তখন ব্যস্ততা চরমে। ছবিটাতে সুর করার জন্য খুব বেশি সময় পাচ্ছিলেন না। খুব অল্প সময়ে তিনি ‘শোনো বন্ধু শোনো’, ‘সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা’, ‘বসে আছি পথ চেয়ে’, ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস’ গানগুলোর সুর করেছিলেন। যে গানগুলো বাংলা সঙ্গীতের এক একটা রত্ন! শোনা যায়, মাত্র তিন দিনেই সুর করেছিলেন। রেকর্ড করেছিলেন। গানগুলি তাঁর নিজের একেবারেই ভাল লাগেনি। ঠিক হল না, এই আফশোস নিয়েই বম্বে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন গান কার কখন ভাল লেগে যায়, কে বলতে পারে! ছবিটা তো হিট হলই, গানগুলোও ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে। বলা যায়, এখান থেকেই তৈরি হল উত্তম–হেমন্ত জুটি। যার আবেদন উত্তম–সুচিত্রা জুটির থেকে কোনও অংশে কম নয়।

মুম্বইতেও তাঁর সুরের যাদু দেখিয়েছেন। 'নাগিন' ছবির কথা আগেই বলা হয়েছে। 'বিশ সাল বাদ' ছবির 'বেকারার করকে হামে' এবং 'কহি দ্বীপ জ্বলে' গান দুটি অমর হয়ে আছে। 'সাহেব বিবি অউর গোলাম' ছবিতে গীতা দত্তকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'না যাও সাঁইয়া'। এই সুরের মধ্যে 'অলির কথা শুনে বকুল হাসে'র ছোঁয়া থেকে গেল। 'এই রাত তোমার আমার' এর সরাসরি হিন্দি অনুবাদ করলেন 'কোহরা' ছবিতে 'ইয়ে নয়ন ডরে ডরে'। 'খামোশি' ছবিতে 'ও শাম কুছ আজিব থি'তে একদম নতুন ভাবে কিশোর কুমারকে পাওয়া যায়। এই ছবির আর একটি গান 'তুম পুকার লো' শুনলে মনে হয়, এত সহ-জভাবেও গান গাওয়া যায়! অকারণ কালোয়াতি নয়, গলার কেরামতি নয়, সুরের ঢেউ খেলানো নয়। যেন আলতো সুরে সবুজ ঘাসের ওপর হেঁটে যাওয়া।

বাংলা গানের কথা বললে পূজার গান আসবেই। কিশোর কুমারের কণ্ঠে কালজয়ী 'আমার পূজার ফুল' হেমন্তের এক অমর সৃষ্টি। এখানেও সেই সহজিয়া সুরের স্পর্শ। এতটাই কালজয়ী, এই গানটা এখনও পূজা প্যান্ডেলে বাজে। এই গানটা ছাড়া বাঙালির পূজা একপ্রকার অসম্পূর্ণ।

সবথেকে বড়ো ব্যর্থতা ১৯৭৬ সালে। সেই বছর মহিষাসুর মর্দিনীর বদলে দেবী দুর্গতি-হারিণী সম্প্রচার হয়েছিল

মহালয়ার ভোরে। মহালয়ায় নতুন জুটি এনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর বদলে উত্তমকুমার ছিলেন। সুরের দায়িত্বে ছিলেন হেমন্ত। বাঙালি মহালয়ার ভোরে উত্তম-হেমন্ত জুটিকে গ্রহণ করেনি। আবার সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়াই চালাতে হয়েছিল।

অনেকে বলতেই পারেন, কিশোর-লতার গান তো তাঁদের নিজেদের গুণেই জনপ্রিয় হয়। তার পেছনে সুরকারদের কৃতিত্ব কোথায়? কিন্তু তথাকথিত বিখ্যাত নন, এমন অনেকে হেমন্তর সুর করা একটি-দুটি গানের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরা যাক। অমৃক সিং অরোরার কথা বললেই মনেপড়ে 'রূপসী দোহাই তোমার'। হৈমন্তী শুক্লা বললেই অনেকের মনে ভেসে উঠবে, 'ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়ো না।' ঠিক তেমনি অরুন্ধতী হোমচৌধুরির 'যেতে যেতে কিছু কথা বলব তোমার কানে কানে' বা 'যত ভাবনা ছিল, যত স্বপ্ন ছিল'। সুজাতা চক্রবর্তীকে কজন চেনেন? কিন্তু তাঁর গাওয়া 'ভুল সবই ভুল' যেন অমরত্ব পেয়ে গেছে। শিবাজি চট্টোপাধ্যায় যে অনুষ্ঠানেই যান, তাঁকে 'খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে', 'এ ছন্দ, এ আনন্দ' বা সেই বিখ্যাত গান 'অভাগা যেদিকে চায়' গাইতেই হয়। এর বাইরে

শিবাজির অন্য কোন গানটা আপনার মনে আছে! এগুলো কয়েকটি উদাহরণমাত্র। চাইলে তালিকাটা অনেক লম্বা হতে পারে।

বলা হয়, তরুণ মজুমদারের ছবি মানেই রবীন্দ্র সঙ্গীত। কিন্তু যেসব ছবিগুলোর কথা বলা যায়, তার সঙ্গীত পরিচালকের নাম কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার এতটাই সুন্দর হয়েছে, অনেকে সেই ছবির গান বলেই মনে করেন। 'চরণ ধরিতে দিও' বেজে উঠলে অনেকেই বলে ওঠেন এটা দাদার কীর্তির গান। বা 'তোমার কাছে এ বর মাগি' গাইলেই অনেকে বলে ওঠেন, এটা ভালবাসা ভালবাসার গান। আসলে, গানগুলো শুনলে মনে হয়, প্রচলিত রবীন্দ্র ঘরানা থেকে অন্যরকম, একেবারে প্রাণবন্ত। এভাবেই রবি ঠাকুরের কত গান পৌঁছে গেছে সিনেমার হাত ধরে।

যাঁরা শুধু সুরকার, তাঁদের ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম। সলিল চৌধুরি, নচিকেতা ঘোষ বা সুধীন দাশগুপ্তরা নিজেরা গান গাইতেন না। ফলে, ভাল সুরগুলো কাউকে না কাউকে দিতেই হত। কিন্তু হেমন্তর ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম। তিনি নিজে গাইতে পারতেন, অথচ মহান সৃষ্টি হাসতে হাসতে তুলে দিচ্ছেন অন্যের হাতে। একই ছবিতে তিনি গেয়েছেন 'তুম পুকার লো'। সেই ছবিতেই সেরা গানটা (ও সাম কুছ আজিব থি) তুলে দিয়েছেন কিশোর কুমারের কণ্ঠে। দারুণ সুর, হিট অবশ্যম্ভাবী জেনেও 'আমার পূজার ফুল' বা 'সে যেন আমার কাছে' তুলে রাখছেন অন্য গায়কের জন্য।

নিজের গান গাইতে গেলে দরাজ কণ্ঠ লাগে। কিন্তু নিজে দুরন্ত কণ্ঠের অধিকারী হয়েও সেরা সুরটা অন্যকে তুলে দিতে দরাজ হৃদয় লাগে। আর এখানেই গায়ক হেমন্তকে ছাপিয়ে যান সুরকার হেমন্ত।

এক ঘরানায় নিজেকে আটকে রাখেননি

সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি

তিন বছর বয়সে বাড়ির টেপরেকর্ডারে প্রথম শুনেছিলাম, ‘রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে’। গানটার কথা, সুর এবং কে গাইছেন এসব কিছুই তখন জানতাম না। কিন্তু কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো গানটা শুনতাম। আর কেন জানি না বারবার শুনে এত লম্বা গানটা মুখস্থ হয়েও গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়িই। তার বেশ কয়েক বছর পরে আস্তে আস্তে জেনেছিলাম গীতিকার, সুরকার এবং সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠের অধিকারীর নাম। তারপরে ‘গাঁয়ের বঁধু’, ‘পাল্কির গান’, ‘অবাক পৃথিবী’ ইত্যাদি শুনতে শুনতে কেমন মিশে গিয়েছিলাম শ্রদ্ধা, ভাল লাগা, প্রেম, ভালবাসা, পাগলামি থেকে ও রেকর্ড সংগ্রহের নেশায়। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ‘অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি’ বা ‘পথে এবার নামো সাথী’ শুনে একটা অন্য ধরণের ভাবালুতা কেমন যেন গ্রাস করে ফেলত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এইভাবেই অগণিত সঙ্গীতপ্রেমীর শ্রদ্ধার্ঘ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক ও ছায়াছবির গানের পাশাপাশি হয়ে উঠেছিলেন গণসঙ্গীতেরও এক সার্থক কণ্ঠশিল্পী।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পরে এক তরুণ কবি ও গীতিকার তখন লুকিয়ে আর পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য তিনি। নিজের লেখা কয়েকটা গীতিকবিতায় সুরারোপ করলেও সেভাবে তখনও পরিচিত হননি। না গীতিকার হিসেবে, না সুরকার হিসেবে। মূলতঃ প্রতিবাদের গান লেখা এবং তাতে সুর দেওয়াই তাঁর প্রধান কর্মধারা। একদিন সেই তরুণ এসেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর লেখা কতগুলো গান শোনাতে। সেটা ১৯৪৯ সাল। তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানে একটু পরিচিতি লাভ করলেও বাংলা গানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শিল্পীরা কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক

এবং শচীন দেববর্মণ। সেই নবাগত তরুণ গীতিকারের প্রায় সবকটি গানই তরুণ হেমন্তর মনঃপূত না হওয়ায় ফিরে যাচ্ছিলেন ভগ্নমনোরথ সেই তরুণ। হঠাৎ কী মনে হল, মাঝপথে আবার ফিরে এলেন। হেমন্তকে শোনালেন তাঁর অর্ধেক রচিত একটি গান। সোল্লাসে মেতে উঠেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই গান শুনে। সেদিনের সেই তরুণ সলিলকে বললেন, পুরো গানটা লিখে নিয়ে আসতে। তারপরই বাংলা আধুনিক গানের জগতে সৃষ্টি হয়েছিল সেই কালজয়ী গান, 'কোনো এক গাঁয়ের বঁধুর কথা তোমায় শোনাই'।

আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরে সেদিনের সেই তরুণ সলিল চৌধুরি তাঁর পরম অগ্রজ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছিলেন 'রানার', 'অবাক পৃথিবী'র মতো একের পর এক শোষিত মানুষের জীবনকাহিনীর গীতিকবিতা। অচিরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্যপদ পেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তখন সলিল-হেমন্ত যুগলবন্দী মানেই ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন দর্শনের একের পর এক সুপারহিট গান। কোথাও ঝড়ের মুখে প্রেমের ছোঁয়ার মতো 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম' বা 'শোনো কোন একদিন, আকাশ-বাতাশ জুড়ে রিমঝিম' বা কোথাও আবার 'মনের জানালা খুলে উকি দিয়ে গেছ', 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' র মতো প্রেম বা বিরহের গান গান। তার পরে এসেছিল সেই অবিস্মরণীয় মুক্তিসংগ্রামের গান 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এ পথ চেনা'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বরে এই গণসঙ্গীত বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল বিপ্লবের বার্তা নিয়ে।

এখানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মুনশিয়ানা। তিনি একাধারে বাংলা ছায়াছবির গানের একচ্ছত্র সম্রাট

হয়ে মধ্যগগনের সূর্যের মতোই দীপ্তি ছড়িয়ে গেছেন। আর হিন্দি ছায়াছবিতেও 'নাগিন' মুক্তির পরে আসমুদ্রহিমাচল তাঁর সুরের স্পর্শে আবিষ্ট হয়েছিল, যা পাঁচের দশক থেকে সাতের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অমলিন ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দুই মূল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। বাংলা ছবিতে উত্তম কুমারের কণ্ঠ যেমন তিনিই, তেমনি উত্তম কুমার ব্যতিরেকে সৌমিত্র, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখের নেপথ্যেও পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় তিনিই। আবার হিন্দি ছবিতেও প্রদীপ কুমার, দেব আনন্দ প্রমুখের নেপথ্যেও হেমন্তই বিরাজিত। তাঁর সুরে লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার থেকে মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দত্তদের কণ্ঠে একের পর এক কালজয়ী সব গান তৈরি হয়েছিল। বাংলার হেমন্ত সেদিন হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী এবং সুরকার।

এ হেন প্রশ্ন থেকে যায়, যাঁর কণ্ঠে 'রানার', 'গাঁয়ের বঁধু', 'অবাক পৃথিবী' বা 'ঠিকানা' বাংলার শহরে, গ্রামে, আকাশে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল ঝড়ের হাওয়ার মতো, তিনি যদি শুধুমাত্র গণসঙ্গীতেই মনোনিবেশ করতেন, তাহলে হয়তো IPTA ছেড়ে বম্বে পাড়ি দিতেন না রত্নলাভের আশায়। গণসঙ্গীতের জগতে তখন সলিল চৌধুরি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখের ভারতজোড়া খ্যাতি। সেখানে পাকাপাকিভাবে চিরস্থায়ী আসন লাভ করা কি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে কঠিন কাজ ছিল ?

আসলে ঘটনাটা হল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কোনওদিনই সঙ্গীতের একটি মাত্র শাখায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর প্রথাগত সাঙ্গীতিক শিক্ষা হয়তো খুব বেশি ছিল না, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনেক রাগ-রাগিনী তে যে তিনি পারঙ্গম ছিলেন না, একথা নিজের মুখেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করে গিয়েছিলেন। তবুও তাঁর ছিল এক আশ্চর্য রকমের সাঙ্গীতিক বোধশক্তি, ছায়াছবির দৃশ্য বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহৃত গানের সুরারোপ করার এক অতুলনীয় দক্ষতা, যা তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম সারির

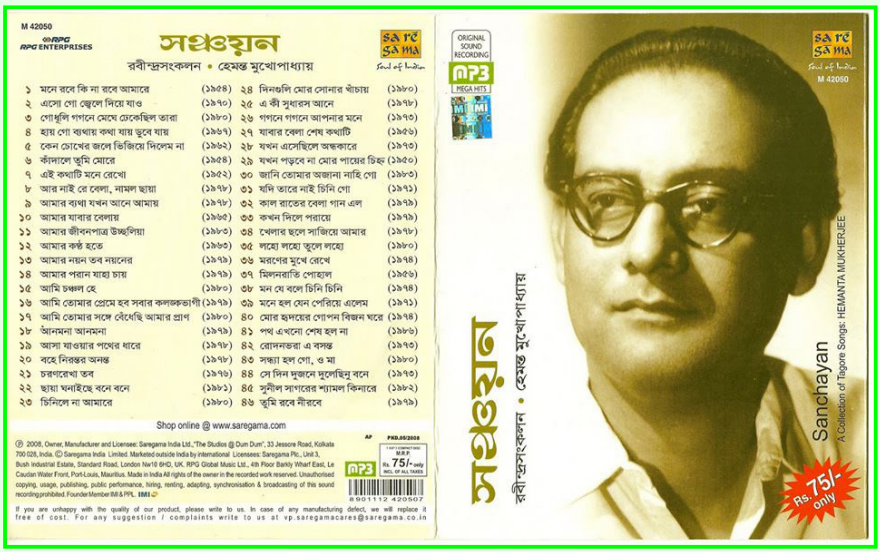

কণ্ঠশিল্পী থেকে বাংলা ও হিন্দি ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের রূপদান করেছিল। বাংলায় রবীন্দ্রগান থেকে নজরুল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গান বা বেসিক গান, হিন্দিতে ছায়াছবির গান ছাড়াও গীত বা গজল এবং ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা যেমন মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া, ভোজপুরি, কোঙ্কনী— সবেতেই তিনি তাঁর ছোঁয়া রেখে যেতে পেরেছিলেন।

গণসঙ্গীতের যে দীপ তিনি জ্বেলে দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরির হাত ধরে, তা বস্তুত অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসেও বাংলার সহস্র সঙ্গীতপ্রেমীর ঘরে ঘরে আজও বেজে চলেছে রেকর্ডে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। সলিল চৌধুরির সুরারোপ ছাড়াও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজের সুরেই রেকর্ড করেছিলেন 'মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে' এবং বাংলার দুর্জয় জনতা' এর মতো দুটি অনবদ্য গান, যা ভারতীয় গণসঙ্গীতের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরার তালিকায় থাকতে বাধ্য।

গজল সম্রাট মেহেদি হাসান হেমন্ত কণ্ঠকে এই উপ মহাদেশের 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ' বলে অভিহিত করেছিলেন। যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল মহাসাগর পেরিয়ে সুদূর আমেরিকাতেও। প্রখ্যাত মার্কিন পরিচালক কনরাড রুকস এর 'সিদ্ধার্থ' ছায়াছবির (১৯৭২) সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যা তাঁকে প্রথম ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে মার্কিন নাগরিকত্বের সম্মান দান করেছিল। সলিল চৌধুরি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর যদি নিজের কণ্ঠে গান গাইতে পারতেন তো তাঁর গলা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের মতোই শোনাতো'। লতা মঙ্গেশকরের কথায়, 'হেমন্তদার কণ্ঠ শুনলে মনে হত কোনো সাধু বা সন্ন্যাসী মন্দিরে নিবিষ্ট চিত্তে ভজন গাইছেন'। আর হেমন্তের পরম সুহৃদ এবং পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'হেমন্তকালের বিকেলে রোদ পড়ে আসা পল্লীগ্রামের বাড়ির নিকোনো উঠোনে গোলা ভরা ধানের মতোই আমাদের হেমন্তের ছিল গলা ভরা গান'!

রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি, কৌতূহল ভরে', তেমনি আজ সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও হয়তো তাঁর জন্মশতবর্ষে বলছেন, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে/পান্থ পাখীর কূজন কাকলি ঘিরে/ আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো/আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে'।

জানা অজানা হেমন্ত

সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি

আসমুদ্র হিমাচল যাঁর কণ্ঠস্বরে প্লাবিত, যাঁর গান ও সুরে তিন প্রজন্মের মানুষ মোহিত হয়েছে, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেন। বলিউডের হেমন্তকুমার, আর বাংলার হেমন্ত। একই মুদ্রার এপিঠ –ওপিঠ। বাঙালির কাছে হেমন্তকালের হিমেল হাওয়ার প্রাণজুড়োনো পরশের মতো ‘হেমন্ত কণ্ঠ’ যেন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এক সঞ্জীবনী সুধা। যা অনাবিল প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে জীবনের চরম, কঠিন, সঙ্কটময় মুহূর্তেও।

তাঁর জন্মশতবর্ষে রইল ১২ টি জানা–অজানা তথ্য। বেশ কয়েকটা হয়ত জানা। কোনওটা হয়ত অজানা।

১. বাংলায় প্রথম বেসিক গান রেকর্ড করেছিলেন ১৯৩৭ সালে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে। শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুর এবং নরেশ ভট্টাচার্যের কথায় গানটি ছিল ‘জানিতে যদি গো তুমি’। আর তাঁর নিজের সুরারোপিত প্রথম বেসিক গান ১৯৪৩ সালে অমিয় বাগচীর কথায়। ‘কথা কোয়ো নাকো, শুধু শোনো’।

২. প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছিলেন ১৯৪৪ সালে ‘আমার আর হবে না দেরী’। বাংলা ছায়াছবিতে রবীন্দ্রগান প্রথম গেয়েছিলেন ১৯৪২ সালে ‘অপরাধী‘ ছবিতে। গানটি ছিলো ‘ওই যে ঝড়ের মেঘে’।

৩. বাংলা ছবিতে প্রথম প্লে ব্যাক ১৯৪০ সালে। ‘নিমাই সন্ন্যাস’ছবিতে, ছবি বিশ্বাসের

লিপে। গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং সুরকার ছিলেন হরিপ্রসন্ন দাস।

৪. নিজের সুরে প্রথম বাংলা ছবিতে গান ১৯৪৭ সালে 'পূর্বরাগ' ছবিতে। এখানে তাঁর সহধর্মিণী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি দ্বৈতকণ্ঠে গান ছিল।

৫. প্রথম হিন্দি ছবিতে প্লে ব্যাক করেছিলেন ১৯৪২ সালে, পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সুরে 'মীনাক্ষী' ছবিতে। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ আরও দশ বছর পর। নিজের সুরারোপিত প্রথম হিন্দি ছবি ১৯৫২ সালে 'আনন্দমঠ'। এই ছবিতেই লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম' যা সারা ভারতবর্ষে আজও সমধিক জনপ্রিয়।

৬. মহানায়ক উত্তমকুমারের লিপে সবচেয়ে বেশি ছবিতে গান করেছিলেন। ছবির সংখ্যা ৩০ টি। প্রথম প্লে ব্যাক ১৯৫১ সালে 'সহযাত্রী' ছায়াছবিতে। তার পরে ১৯৫৫ সালে নিজের সুরারোপিত 'শাপমোচন' ছবি দিয়ে বাংলায় উত্তম –হেমন্ত জুটির জয়যাত্রা শুরু যা প্রায় ২৫ বছর ধরে চলেছিল। উত্তম কুমারের লিপে সর্বশেষ প্লে ব্যাক ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত (উত্তমকুমারের প্রয়াণের পরে) 'খনা বরাহ' ছবিতে। এখানে একটি স্তোত্র বা সংস্কৃত শ্লোক ছিল হেমন্ত কণ্ঠে।

৭. মোট ১৩৮ টি বাংলা ছায়াছবিতে সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সুরারোপিত প্রথম ছায়াছবি 'পূর্বরাগ'-(১৯৪৭) এবং শেষ ছবি তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'আগমন' (১৯৮৮)।

৮. বলিউডে তাঁর সুরারোপিত ছবির সংখ্যা ৫৪। প্রথম ছবি 'আনন্দমঠ'-(১৯৫২)। শেষ সুরারোপ সদ্যপ্রয়াত বাসু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'দো লড়কে দোনো করকে' (১৯৭৯)।

৯. বাংলা এবং হিন্দি ছাড়াও দুটি ভোজপুরি ও একটি মারাঠি ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। ভোজপুরি ছায়াছবি দুটির নাম ছিল ‘আয়েল বসন্ত বাহার’-(১৯৬৩) এবং বালমা বড়া নাদান-(১৯৬৪)। আর মারাঠি ছবিটির নাম ‘নায়িকিঞ্চি সাজ্জা’-(১৯৫৭)। সুরারোপ ছাড়াও মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া, তামিল, অসমীয়া, ভোজপুরি, কোঙ্কনী এবং পাঞ্জাবি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষায় তিনি গান রেকর্ড করেছিলেন।

১০. হেমন্তের সুরের খেয়া দেশের বাইরে সুদূর আমেরিকাতেও পৌঁছেছিল। ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত মার্কিনী চলচ্চিত্রকার কনরাড রুকস নির্মাণ করেছিলেন ‘সিদ্ধার্থ’ ছায়াছবি। যার সুরকার ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই কৃতিত্বের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনিই ভারতের প্রথম কণ্ঠশিল্পী যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন।

১১. ২ টি বাংলা এবং ৮ টি হিন্দি ছবি প্রযোজনাও করেছিলেন। বাংলাতে একটি ছায়াছবি পরিচালনাও করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত এবং প্রযোজিত ছবি ‘অনিন্দিতা’, যা আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত। তাঁর প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছায়াছবি মৃণাল সেনের পরিচালনায় নির্মিত ‘নীল আকাশের নীচে;-(১৯৫৯)। আর হিন্দি ছবির জগতে তাঁর প্রযোজিত ছবির সংখ্যা ৮ । এগুলি হল বিশ সাল বাদ, কোহরা, ফারার,

মঝলি দিদি, বিবি আউর মাকান, রাহগীর, খামোশী এবং বিশ সাল পেহেলে।

১২. সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে ‘নাগিন’ ছবির জন্য। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালে ‘নিমন্ত্রণ’ এবং ১৯৮৬ সালে ‘লালন ফকির’ ছবিতে প্লে ব্যাক করার সুবাদে। আর BFJA পুরস্কার পেয়েছিলেন মোট ১২ বার। তার মধ্যে ৯ টি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে এবং ৩ টি নেপথ্য গায়ক হিসেবে। ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্রগানে বিশ্বভারতীর সাম্মানিক ডি-লিট, ১৯৮৬ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরস্কার পেয়েছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী।

গণতন্ত্রের সত্যিই সঙ্কট, তাই সৌমিত্ররাও ‘পূর্ণমন্ত্রী’ হতে চান

সরল বিশ্বাস

বছর পাঁচ আগের কথা। তিনি সেবার সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। দুই দলেই দলবদলুদের বিশেষ কদর। তাই বিজেপিতে এসে টিকিট পেতে সমস্যা হয়নি।

আগেরবার দেওয়ালে লেখা ছিল, তৃণমূল প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে ভোট দিন। পরেরবার দেওয়াল লিখন বদলে ‘বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে ভোট দিন’। যে দলে ছিলেন, সেই দলের বিরুদ্ধেই তিনি তখন হুঙ্কার ছাড়ছেন। বলে বসলেন, ‘আমি চ্যালেঞ্জ করছি, অভিষেক ব্যানার্জির ক্ষমতা থাকলে আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াক।’

অভিষেককে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেই পারেন। কিন্তু ‘আমার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াক’ এই চ্যালেঞ্জটার কী মানে? বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। সেখানে অভিষেক কীভাবে দাঁড়াবেন? তাঁর যদি এতই চ্যালেঞ্জ নিতে ইচ্ছে হয়, তিনি গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াতে পারতেন। বা অন্য কোনও কেন্দ্রে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন।

আসলে, এই হল মুশকিল। তিনি যে তপশিলি সংরক্ষিত আসনে লড়ছেন, সেই আসনে যে জেনারেল কাস্টের কেউ দাঁড়াতে পারবেন না, এটুকুও খেয়াল থাকে না। এইসব লোক এমপি হলে যা হয়, তাই হয়েছে। এবার জেতার পর তিনি দাবি জানিয়ে বসলেন, ‘আমাকে পূর্ণমন্ত্রী করা হোক।’ দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না। একেবারে প্রকাশ্যে বিভিন্ন চ্যানেলে বলতে থাকলেন। আমাকে পূর্ণমন্ত্রী করতে হবে, কাউকে এমন দাবি করতে শুনিনি।

তিনি বললেন, সুকান্ত আমার থেকে জুনিয়র। আমি ওর আগে থেকে এমপি। কিন্তু এই আহাম্মককে কে বোঝায়, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার একজন ডক্টরেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আর তিনি ছিলেন হায়ার সেকেন্ডারি পাস পঞ্চায়েতের ঠিকাদার। এই তফাতটা কতটা, বোঝার বিদ্যেটুকু তিনবারের সাংসদের নেই। আসলে, যাঁর পঞ্চায়েত মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নেই, তিনি হঠাৎ করে এমপি হয়ে গেলে এমনটাই হয়। তিনি কিনা দাবি করে বসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করতে হবে। তাও আবার পূর্ণ মন্ত্রী। আচ্ছা, উচ্চারণ তো করে দিলেন। 'পূর্ণমন্ত্রী' বানানটা লিখতে দিলে লিখতে পারবেন! এমপি হওয়ার আগে বিষ্ণুপুর বানানটাও ইংরাজিতে লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আসলে, দোষটা শুধু সৌমিত্রর নয়। আশেপাশে এমন এমন লোকজনদের দেখছেন, তাঁর মনে হয়েছে, এঁরা হলে আমি নয় কেন? তিনি দেখছেন, প্রধানমন্ত্রী এমন একটা বিষয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, যে সাবজেক্টটার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। তিনি দেখছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন একজন, যিনি সিবিআই বা ইডি রিপোর্ট দিলে এক পাতা পড়ে বুঝতে পারবেন না।

এই রাজ্যেও নমুনার অভাব ছিল না। তিনি দেখেছেন মাধ্যমিক পাস নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি দেখেছেন জন বার্লা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাই হয়তো তাঁরও ইচ্ছে হয়েছে। আসলে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদটার কী ওজন, এটা বুঝতে গেলে ন্যূনতম যেটুকু পেটে বিদ্যে থাকা দরকার, তা এই কীর্তিমানের নেই। কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করা সমীচিন নয়। কিন্তু পনেরো লাখ মানুষের প্রতিনিধির যদি ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞানটুকু না থাকে, তখন আয়না ধরাটাও জরুরি।

হ্যাঁ, এই অর্বাচীনরাই সাংসদ। এই অর্বাচীনরাই কেন্দ্রে 'পূর্ণমন্ত্রী' হতে চান। কাকে জেতালেন, বিষ্ণুপুরের মানুষও কি একটু আত্মসমীক্ষা করবেন না!

ভারতে রাত আটটা! তাহলেই চলবে

স্বরূপ গোস্বামী

কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়। টি২০ বিশ্বকাপ দেখতে দেখতে কথাটা যেন মনে পড়ে যাচ্ছে। কদিন আগেই আইপিএল শেষ হয়েছে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বিশ্বকাপ। সেই রঙিন পোশাক, সেই সাদা বল। আইপিএল হয়েছিল ভারতের মাটিতে। আর এই বিশ্বকাপ হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকার মাটিতে। কী আশ্চর্য! খেলার সময়টা প্রায় একই। আইপিএল ছিল সন্ধে সাড়ে সাতটায় শুরু। আর বিশ্বকাপ শুরু রাত আটটায়।

কিন্তু যেসব দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে, সেইসব দেশে তখন সময় কত? কোথাও সকাল দশটা, কোথাও আবার সাড়ে দশটা। আমেরিকায় ততটা

গরম না থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজে গরম বেশ ভালই, এমনকী ভারতের থেকেও বেশি। সেই দেশে কিনা সকাল দশটায় টি২০ ম্যাচ শুরু হচ্ছে!

টি২০ যখন চালু হল, তার কনসেপ্ট কী ছিল? সাদা বল, রঙিন পোশাক। আর দিন-রাতের ম্যাচ। মোদ্দা কথা, কাজ কামাই করে মানুষের খেলা দেখার সময় নেই। তাই এই ক্রিকেট শুরু হবে সন্ধের দিকে। তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আইপিএল থেকে শুরু করে ভারতে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলি সেই নিয়ম মেনেই হয়। অন্যান্য দেশও যখন নিজেদের মধ্যে সিরিজ খেলে, রাতেই খেলে।

কিন্তু ভারতের সঙ্গে খেলা হলেই যেন নিয়ম বদলে যায়। তখন খেলাটা আর দিন রাতের থাকে না। মোদ্দা কথা, ভারতে যখন সন্ধে সাড়ে সাতটা বা রাত আটটা, তখন খেলা শুরু হবে। তাতে সেই দেশে কটা বাজল, তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। এক বছর আগের ঘটনা। ভারত সেবারও গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। প্রথমে একদিনের সিরিজ। পরে টি২০ সিরিজ। সব ম্যাচই শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। ওই সিরিজেরই শেষ দুটি ম্যাচ ছিল ফ্লোরিডায়। সেখানেও ম্যাচ শুরু সেই ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। তারপর ভারত গেল আয়ারল্যান্ড সিরিজে। অর্থাৎ, মার্কিন মুলুক থেকে সোজা ইউরোপ। দুই দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেকটাই। কী আশ্চর্য! এবারও খেলা শুরু হল ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

তার মানে, যে দেশে খেলা হচ্ছে, সেই দেশের ঘড়িতে কটা বাজছে, তার কোনও মূল্য নেই। সেই দেশের দর্শকদের কখন সুবিধা-অসুবিধা, তার কোনও মূল্য নেই। ভারতে কখন সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজবে, সেটাই হল আসল কথা। ক্রিকেট বিশ্বের ওপর ভারতের দাদাগিরি কোন স্তরে

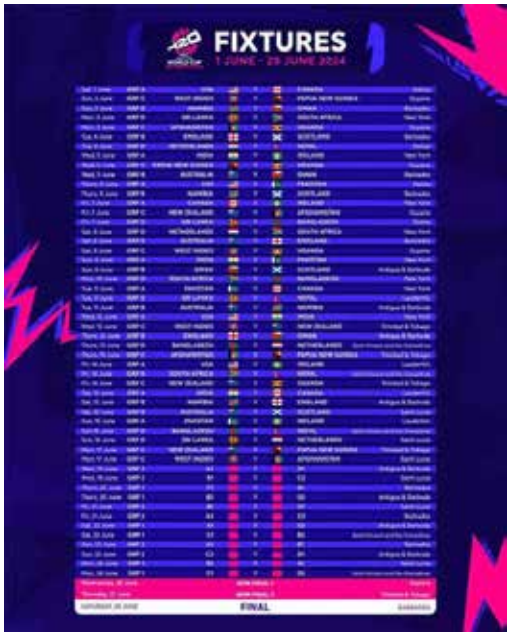

গেছে, এটাই তার সবথেকে বড় প্রমাণ।

আমাদের দেশে যখন দিনরাতের ম্যাচ হয়, তখন একদিনের ম্যাচ আর টি২০ কখন শুরু হয়! একদিনের ম্যাচ সাধারণত দুপুর দেড়টা–দুটো নাগাদ শুরু হয়। যেন দশটার মধ্যে হয়ে যায়। আর টি২০ শুরু হয় সাতটা–সাড়ে সাতটা নাগাদ। এক্ষেত্রেও লক্ষ্য থাকে দশটা–সাড়ে দশটার মধ্যে খেলা শেষ করে দেওয়ার। যেন দর্শকদের বাড়ি ফিরতে তেমন সমস্যা না হয়। কিন্তু অন্য দেশে আয়োজকদের সেই স্বাধীনতা নেই। তাঁদের নামতে হবে তখন, যখন ভারতে সাড়ে সাতটা বাজবে। তাতে সেই দেশে সকাল হতে পারে, দুপুর হতে পারে, বিকেল হতে পারে।

বিশ্বকাপেও সেই একই ট্রাডিশন। এবার সময়টা আধঘণ্টা পিছিয়েছে। সন্ধে সাড়ে সাতটার বদলে রাত আটটা। অর্থাৎ, খেলা নিউ ইয়র্কেই হোক বা বার্বাডোজেই হোক, শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত আটটায়। তাতে সেই দেশে কখন শুরু হল, সেই দেশের লোকেরা দেখতে পেলেন কিনা, কিচ্ছু যায় আসে না। আচ্ছা, নিউ ইয়র্কে কি সত্যিই নৈশালোকের ব্যবস্থা করা যেত না? যারা তিন মাসের মধ্যে আস্ত একটা স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারে, খেলা হয়ে গেলে তা আবার গুঁড়িয়ে দিতে পারে, তাদের কাছে কয়েকটা বাতিস্তম্ভ লাগানো খুব কি কঠিন ছিল?

তাহলে, নৈশালোকের ব্যবস্থা হল না কেন? আপনার, আমার মতো আম ভারতীয়দের জন্যই। আমরা যেন রাত আটটায় খেলা দেখতে পারি, সেইজন্য। আমরা রাত আটটায় দেখতে চাইলে ওখানে সকাল দশটায় শুরু করতে হবে। আর দিনের বেলায় সূর্যের চড়া আলোয় নৈশালোক দরকার নেই। সেই জন্য। এবার বোঝা গেল, খেলা যেখানেই হোক, ভারতে তখন যেন রাত আটটা বাজে।

বেঙ্গল টাইমস

১৬ জুন, ২০২৪

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ই মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী